সুকথা

সুকথা

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন-প্রণীত

মূল্য ৷৷৵০ বার আনা ।

কলিকাতা

২।১।৩ শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, বাগবাজার
"বিশ্বকোষ-প্রেসে"
শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

প্রথম সংস্করণ

১লা আগষ্ট, ১৯১২

প্রকাশক
শ্রীঅতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
অতুল-লাইব্রেরী, ঢাকা।

স্নেহাস্পদ

শ্রীমান্ বিনয়চন্দ্র সেনকে

তাহার জন্মতিথি উপলক্ষে

এই পুস্তকখানি দিয়া

আশীর্ব্বাদ করিলাম।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

সূচী

সুকথা

মাতৃগুপ্ত

পুরাকালে উজ্জয়িনী নগরে হর্ষ-বিক্রমাদিত্য নামে এক প্রবল-পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি শকদিগকে পরাজয় করাতে 'শকারি বিক্রমাদিত্য' নামেও পরিচিত হইয়া থাকেন। মহারাজ হর্ষের সভায় মাতৃগুপ্ত নামক তৎকালপ্রসিদ্ধ কবি উপস্থিত হইয়া রাজপ্রসাদাকাঙ্ক্ষী হইলেন। মাতৃগুপ্ত শুনিয়াছিলেন ভারতীয় আর কোন রাজা হর্ষের ন্যায় গুণ-

বানের আদর করিতে জানিতেন না। উজ্জয়িনীর রাজসভা পণ্ডিতমণ্ডলীর কাব্যালাপে নিত্য মুখরিত ছিল। রাজা সর্ব্বগুণের আধার, তাঁহার তোষামোদ-প্রিয়তা ছিল না; কোন যোগ্য ব্যক্তি তাঁহার সভায় পুরস্কার হইতে বঞ্চিত হইত না এবং রাজা কখনই কোন কুমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না। মাতৃগুপ্ত এইরূপ রাজসভার সংশ্রবে আসিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলেন।

মাতৃগুপ্তের কবিত্বের যশঃ সেই সময় দেশময় ব্যাপ্ত ছিল। তথাপি তিনি এরূপ নিরভিমান ও বিনীত ছিলেন যে, তিনি পণ্ডিতগণের সঙ্গে একত্র উপবেশন না করিয়া রাজাদেশপ্রতীক্ষায় সভার এক নিভৃত কোণে আসন গ্রহণ করিতেন। রাজা অল্প সময়ের মধ্যেই কবির বিবিধ গুণের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন,

কিন্তু তিনি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে মাতৃগুপ্তের প্রতি আপাততঃ কোন অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন না। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, মাতৃগুপ্ত সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় প্রভুর অনুগমন করিতে লাগিলেন। রাজপ্রসাদ না পাইয়া তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন না, প্রত্যহ তিনি অনাড়ম্বরে রাজাজ্ঞা প্রতিপালন-পূর্ব্বক দীনভাবে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজদ্বেষী নিন্দকগণের সঙ্গে তিনি ভ্রমেও আলাপ করিতেন না। -কোন অশিষ্ট আলাপ শুনিলে তিনি তথা হইতে উঠিয়া যাইতেন ; রাজার বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে তিনি তাহা রাজার কর্ণে তুলিতেন না। তাঁহার অপুরস্কৃত, স্থির এবং অবিচলিত রাজভক্তিদর্শনে রাজভৃত্যগণ তাঁহাকে নানারূপ ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত, কিন্তু তদ্দ্বারা তিনি কিছু

মাত্র বিচলিত হইতেন না। কোন ব্যক্তির গুণের পরিচয় পাইলে তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহার প্রশংসা করিতেন, এবং কোন প্রকার অনুগ্রহ না পাইয়াও কর্ত্তব্য কর্ম্মে কিঞ্চিন্মাত্র শিথিলতা প্রদর্শন করিতেন না।

একদা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় মাতৃগুপ্তের প্রতি রাজার দৃষ্টি নিপতিত হইল; অনাহারে কবির দেহ শীর্ণ হইয়াছিল, একখানি মলিন ও ছিন্ন বস্ত্রে তাঁহার অঙ্গ আবৃত ছিল, অথচ তৎপ্রতি তাঁহার দৃক্‌পাত নাই; প্রভুর আদেশের জন্য তিনি স্থিরভাবে প্রতীক্ষা করিতেছেন। মাতৃগুপ্তের অবস্থা দেখিয়া রাজার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, তিনি নিজকে ধিক্কার দিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—এই পরম যোগ্য ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আমি কত না কষ্ট দিতেছি! শীতগ্রীষ্মে

ইঁহার শরীর অনাবৃত, অনাহারে শরীর শীর্ণ, রোগ হইলে কে ইঁহাকে চিকিৎসা করে ? আমি ইঁহার প্রতি কোন যত্ন প্রদর্শন করি নাই। অনুতপ্ত হৃদয়ে রাজা কবিকে পুরস্কৃত করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তৎকালে ভাবিয়া চিন্তিয়া কি পুরস্কার দিবেন, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এই ভাবে আরও ছয় মাস কাটিয়া গেল। তখন শীতকাল উপস্থিত হইয়াছে, উজ্জয়িনীর বিহগকুল শৈত্যাধিক্যে পক্ষপুট গুণ্ঠিত করিয়া বৃক্ষশাখায় নীরব হইয়া গিয়াছে। যব-গোধূমাচ্ছন্ন প্রান্তরবাহী, নদীনীরসিক্ত বায়ুপ্রবাহে নৈশ আকাশ ঈষৎ কম্পিত। উজ্জয়িনীর অধিবাসীরা নানারূপ উষ্ণ বস্ত্রে অঙ্গ আবৃত করিয়া দারুণ নৈশ বায়ু হইতে আত্মরক্ষা করিতেছে।

এইরূপে এক রাত্রিতে রাজা হর্ষদেবের

নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল, তখন তৈলাভাবে গৃহদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ, রাজা তাঁহার প্রহরিগণকে সেই দীপে তৈলনিষেকের জন্য আহ্বান করিলেন, কিন্তু শৈত্যাধিক্যে প্রহরিগণ গাঢ় নিদ্রার বশবর্ত্তী হইয়াছিল। "বাহিরে কে আছ ?" এই প্রশ্নের উত্তরে রাজা শুধু শুনিতে পাইলেন,—"আমি মাতৃগুপ্ত।" তখন আদেশপ্রাপ্ত হইয়া বিচিত্ররূপে সজ্জিত রাজার সুরম্য শয়ন-প্রকোষ্ঠে মাতৃগুপ্ত প্রবেশ করিলেন, এবং তৈলনিষেকে দীপটি প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন। "কত রাত্রি হইয়াছে" রাজা জিজ্ঞাসা করাতে মাতৃগুপ্ত বিনীতভাবে জানাইলেন, রাত্রি প্রভাতের আর এক প্রহর মাত্র বাকী আছে। রাজা বলিলেন,—"তুমি কিরূপে তাহা জানিলে ? তুমি কি রাত্রিতে ঘুমাও নাই ?" সুযোগ পাইয়া মাতৃগুপ্ত তখনই একটি কবিতা

দ্বারা স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন—তাহার করুণ ছন্দঃ রাজার হৃদয় নিরতিশয় ব্যথিত করিল। তিনি তাঁহাকে কয়েকটি সান্ত্বনার কথা বলিয়া বিদায় দিলেন, কিন্তু তাঁহার যোগ্যতা ও অভাবের পরিচয় পাইয়াও এতদিন তাঁহার প্রতি কোনরূপ ব্যবস্থা করেন নাই, এই জন্য রাজার মনে তীব্র অনুতাপ উপস্থিত হইল।

এই সময় কাশ্মীর রাজসিংহাসন শূন্য ছিল, এবং কাশ্মীরবাসীরা মহারাজ হর্ষকে তথাকার রাজা নির্ব্বাচন করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। রাজা মাতৃগুপ্তকেই এই পদের সর্ব্বতোভাবে যোগ্য মনে করিলেন এবং সেই রাত্রেই স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া রাজদূত প্রেরণ-পূর্ব্বক কাশ্মীরে সংবাদ পাঠাইলেন যে, মাতৃগুপ্ত নামক জনৈক গুণবান্ পুরুষকে তিনি কাশ্মীরের রাজসিংহাসনের উপযুক্ত

মনে করিয়াছেন। উক্ত মহাত্মা তাঁহার আদেশপত্র লইয়া উপস্থিত হইলে যেন তাঁহাকেই অভিষিক্ত করা হয়। আদেশ-পত্রখানিও সেই রাত্রেই প্রস্তুত করাই-লেন এবং তৎপরে নিদ্রার্থ শয়নপ্রকোষ্ঠে পুনঃপ্রবেশ করিলেন।

এদিকে মাতৃগুপ্ত ভাবিলেন, রাজা তাঁহার দুঃখমোচনের কোনই ব্যবস্থা করিলেন না। তাঁহার মন কতকটা নিরাশ হইল, কিন্তু তিনি এই ভাবিয়া আশ্বস্ত হইলেন যে, কর্ত্তব্যকর্ম্ম অবিচলিত ভাবে সাধন করিলে যে আত্মতৃপ্তি লাভ হয়, তাহাই তাঁহার প্রাপ্য এবং তাহা হইতে কেহ তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। সময় হইলে ঈশ্বর আমাকে পুরস্কৃত করিবেন, কিন্তু আমি তজ্জন্য প্রতীক্ষা করিয়া উপস্থিত কর্ত্তব্য অবহেলা করিব না। দুঃখের ভাবকে হৃদয়মধ্যে

উপেক্ষা করিয়া কর্ত্তব্যনিষ্ঠ অধ্যবসায়ের সহিত পরদিন আবার তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

রাজসভা হইতে এই সময় দূত আসিয়া তাঁহাকে রাজসন্নিধানে লইয়া গেল। রাজা বিচারকবেশে সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি মাতৃগুপ্তকে দেখিয়া সেই আদেশ-লিপিখানি তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলেন, "তুমি এখনই কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা কর, কিন্তু সাবধান! এই পত্রখানি খুলিয়া পড়িও না, কাশ্মীর-রাজ্যের শাসনভারপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারীর হস্তে এই পত্রখানি প্রদান করিও।"

চারিদিকে লোক কাণাকাণি করিতে লাগিল, রাজা মাতৃগুপ্তের প্রতি কোন সুবিচারই করিলেন না, এত কষ্ট দিয়াও রাজা ইঁহার প্রতি সদয় হইলেন না, এখন কি না অতি হীন পত্রবাহকের

কার্য্যে ইঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। ইঁহার এই অসামান্য পাণ্ডিত্য ও প্রভুভক্তির কোন পুরস্কারই হইল না।

মাতৃগুপ্ত সেই সকল সহানুভূতি-ব্যঞ্জক কথায় কর্ণপাত করিলেন না। যে সকল আদর ও প্রশংসায় লোকের বুদ্ধি-ভ্রংশ বা কর্ত্তব্যচ্যুতি ঘটিতে পারে, তাহা তিনি উপেক্ষা করিতেন। দৃঢ় সংকল্পারূঢ় কবি দীনবেশে কাশ্মীরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎকাল পথ পর্য্যটন করিবার পর কাশ্মীরসীমায় সুদূরগগনাবলম্বী শ্বেত-মেঘমালার ন্যায় হিমাদ্রিশিখর তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। কখনও বা শৈলশৃঙ্গ সূর্য্যকিরণে নানা বর্ণে উজ্জ্বল হইয়া দূরব্যাপী স্বর্ণকিরীটের শোভা ধারণপূর্ব্বক তাঁহার নেত্র রঞ্জন করিতে লাগিল; হিমালয়ের বিচিত্র উদ্ভিদ্-

সম্পদ্ নাট্যশালার দৃশ্যপটের ন্যায় তাঁহার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইল এবং সুগন্ধ দেবদারুবাহিত নদীনীরসিক্ত বায়ুহিল্লোল তাঁহার উষ্ণীষের প্রান্তভাগ ঈষৎ কম্পিত করিতে লাগিল।

মাতৃগুপ্ত ক্রমাবর্ত্ত নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইলেন, কাশ্মীররাজ্যের প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণ কি কারণে তথায় অবস্থান করিতেছেন। তিনি সেই স্থানে মলিন বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুক্লবস্ত্র পরিধান করিলেন, এবং তথাকার প্রধান রাজকর্ম্মচারীর নিকট উজ্জয়িনীরাজের আদেশলিপি প্রেরণ করিলেন। তখন বিচিত্র পরিচ্ছদ-ধারী প্রধান রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নামই কি মহাত্মা মাতৃগুপ্ত ?"

মাতৃগুপ্তের পরিচয় পাইয়া তাঁহারা তাঁহাকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিবার প্রস্তাব জ্ঞাপন করিলেন। মাতৃগুপ্ত বুঝিলেন, পরমকারুণিক উজ্জয়িনীরাজ তাঁহার কথা ভুলিয়া যান নাই, স্বীয় সাম্রাজ্য হইতে রম্যতর রাজ্য তাঁহাকে প্রদান করিয়াছেন। কৃতজ্ঞতায় তাঁহার চক্ষু বারংবার অশ্রুপূর্ণ হইতে লাগিল।

রাজসিংহাসনে আসীন হইয়া প্রজাগণের জয়ধ্বনির সঙ্গে তিনি অভিষিক্ত হইলেন। রাজতরঙ্গিণীকার কহ্লন কবি লিখিয়াছেন—অভিষেকের জলধারা বিন্ধ্যগাত্রে রেবাপ্রবাহের ন্যায় তাঁহার বক্ষোদেশ প্লাবিত করিয়াছিল। রাজা হইয়া তিনি মহারাজ হর্ষকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, অবিরল অশ্রুবিন্দুপাতে তাহার প্রতি ছত্র অভিষিক্ত হইয়াছিল।

মহারাজ মাতৃগুপ্ত কিঞ্চিন্ন্যূন পঞ্চবর্ষ

কাল কাশ্মীররাজ্য সুশাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে উক্ত রাজ্যের অশেষ-রূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। মহারাজ হর্ষ-বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া ব্যথিত চিত্তে তিনি রাজপদ ত্যাগ করিলেন এবং যতিধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক জীবনের অবশিষ্ট কাল কাশীতে বাস করিয়াছিলেন।

মাতৃগুপ্তের অবিচলিত কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের কাহিনী কাশ্মীর-ইতি-হাসের একাংশ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

সূর্য্য স্থপতি

প্রাচীন হিন্দুগণের পার্থিব কীর্ত্তিগুলি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা লঙ্কার বৈভব ও ইন্দ্রপ্রস্থের সমৃদ্ধির কথা অনেকটা উপকথা বলিয়াই মনে করি। পরকীয় আক্রমণে ও রাষ্ট্রবিপ্লবে হিন্দুসভ্যতার বাহ্য সম্পদের কিছু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—কেবল মাত্র এলিফেণ্টা-গুহার নিভৃত নিকেতনে বিরাট্ প্রাচীন শিল্প অস্তমিত গৌরবের শেষ চিহ্ন লুকাইয়া রাখিয়াছে—কেবল মাত্র ভারতসাগরে ঊর্ম্মিবিধৌত সুদূর যবদ্বীপে বিশাল "বড়-বদর" মন্দির অগণিত দেববিগ্রহ বক্ষে ধারণ করিয়া ভাস্কর ও স্থাপত্যবিদ্যার তৎকালীন উৎকর্ষ নীরবে ঘোষণা করিতেছে। ওলন্দাজ-সরকার-

কর্তৃক প্রকাশিত সেই সকল কীর্ত্তির ছবি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়া যাই। উড়িষ্যার নীলগিরিতে সুপ্রসিদ্ধ কোণার্ক মন্দির অতীতকীর্ত্তির অর্দ্ধ-ভগ্ন স্তূপমালা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু এই সমস্ত ধ্বংসাবশেষ একত্র করিলে আমরা যাহা পাই, তাহা প্রাচীন সমৃদ্ধির অতি নগণ্য অংশ।

যে সকল শিল্পী, ভাস্কর ও স্থপতি-বিদ্যা-বিশারদ এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন, তাঁহাদের নাম কোন ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নাই। কখনও কোন শিল্পী কোন তাম্রফলকের নিম্নে বা প্রস্তর-নির্ম্মিত বাসুদেব বিগ্রহের পশ্চাতে স্বীয় নামাঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই চিহ্ন তাঁহাদিগকে পরিচিত করিতে পারে নাই, তাহা সময়-স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে।

কিন্তু একজন অতি দক্ষ শিল্পীর বিবরণ আমরা কাশ্মীরের ইতিহাসে দেখিতে পাই, তিনি যে কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল,—এখনও কিছু আছে কিনা বলিতে পারি না।

এই শিল্পীর নাম সূর্য্য। ইনি প্রাচীন কালের অতি প্রসিদ্ধ স্থপতি। খৃষ্টীয় ৮৫৫ অব্দে কাশ্মীর-রাজসিংহাসনে অবন্তীরাজ অধিষ্ঠিত ছিলেন, ইনি ২৮ বৎসর রাজত্ব করেন, ইঁহারই রাজত্বকালে শিল্পি-শ্রেষ্ঠ সূর্য্য তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা-বলে কাশ্মীররাজ্যের বিচিত্র ইষ্টসাধন করেন।

কাশ্মীররাজ্য বহু নদী ও হ্রদে পরিপূর্ণ, উহা কোন কালেই খুব উর্ব্বর দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। মহারাজ ললিতাদিত্যের সময় জল-

নিঃসরণের বিশেষ ব্যবস্থা হওয়াতে কাশ্মীরের কোন কোন স্থান কথঞ্চিৎ উর্ব্বরতা লাভ করে। কিন্তু পরবর্ত্তী নৃপতিবর্গ ভূমির উৎকর্ষসাধনে কোন মনোযোগ প্রদান করেন নাই। সুতরাং ক্রমাগত বন্যার জল অপ্রতিরুদ্ধ গতিতে সমস্ত দেশ প্লাবিত করিতে থাকে, এই কারণে কাশ্মীর দুর্ভিক্ষের উৎপাতে প্রায় জনমানবশূন্য হইয়া পড়িল। প্রতি খাড়ি (১০ মণ, ১২ সের) ধান্যের মূল্য ১০৫০ দীনার হইয়া দাঁড়াইল। মনুষ্য ও গৃহপালিত পশুগণের যেরূপ অবস্থা হইল, তাহা বর্ণন করা যায় না।

চণ্ডালগৃহে পালিত সূর্য্য এই সময় রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া জানাইলেন যে, যদি রাজা তাঁহাকে মুক্ত হস্তে ধন প্রদান করিতে কুণ্ঠিত না হন, তাহা হইলে তিনি এই দেশময় দুর্ভিক্ষ ও

জলপ্লাবন হইতে প্রকৃতিপুঞ্জকে রক্ষা করিতে পারেন।

রাজসভা উপহাসের অট্টহাস্যে মুখরিত হইয়া উঠিল, দেশের সমস্ত গণ্যমান্য লোক এই বিপদের উদ্ধার করিতে পারিতেছেন না, আর চণ্ডাল যুবক কোথা হইতে ধৃষ্টতাপ্রকাশ করিতে আসিয়াছে, ইহার কি আশ্চর্য্য সাহস!

সূর্য্যের প্রতিভাদীপ্ত চক্ষু ও কথা বলিবার ভঙ্গীতে অবন্তীবর্ম্মার মনে অন্যরূপ ধারণা হইল, তিনি এই চণ্ডাল-যুবকের জন্য রাজকোষ মুক্ত করিয়া দিলেন।

সূর্য্য বিতস্তা নদীর তীরস্থিত নন্দক গ্রামে উপস্থিত হইলেন, এই পল্লী জলমগ্ন ছিল, সেই জলপ্লাবিত স্থানে উন্মত্তের ন্যায় সূর্য্য থলিয়াপূর্ণ দীনার নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ

পাইয়া মন্ত্রীর দল রাজার কাছে সূর্য্যকে উপহাস করিয়া অনেক কথা বলিলেন, রাজা আরও কিছুকাল প্রতীক্ষা করিয়া ফলাফল জানিতে উৎসুক রহিলেন। ক্রমে রাজ্যের অন্তর্গত জলপ্লাবিত যক্ষোদর নগরেও সূর্য্য এইভাবে জল-নিম্নে দীনার বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, চারিদিক্ হইতে লোকেরা হাসিতে লাগিল। এই স্থানে দুই দিকের পাহাড় হইতে বড় বড় প্রস্তর ধসিয়া পড়িয়া বিতস্তার গতিরোধ করিয়াছিল, বিতস্তার জল এইজন্য চারিপার্শ্বের পল্লীগুলি গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। জলনিক্ষিপ্ত দীনার-লোভে শত শত লোক ডুব মারিয়া প্রস্তর সঁরাইয়া ফেলিতে লাগিল, অসংখ্য লোকের প্রাণান্ত চেষ্টায় সেই প্রস্তর-সমূহ স্থানচ্যুত হইয়া গেল ও বিতস্তার জল বন্ধনমুক্ত হইয়া বহির্গত হইল।

জল নিঃশেষ হওয়া মাত্র সূর্য্য বিতস্তার মুখে সাত দিনের মধ্যে একটা প্রস্তরের বাঁধ প্রস্তুত করিলেন এবং নদীর নিম্নতল হইতে আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া বাঁধটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তখন নদী পুনরায় যেন নবজীবন লাভ করিয়া সাগরসঙ্গমে ছুটিল এবং সমস্ত জল নদীপ্রবাহে আবদ্ধ থাকিয়া তীরগুলি জাগাইয়া তুলিল, জলমগ্ন দেশ যেন সহসা জল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানান্তে অঙ্গনার ন্যায় ধীরে ধীরে শস্যের শ্যামাঞ্চল খানিতে অঙ্গে জড়াইয়া ফেলিল।

অপর যে সকল স্থানে বিতস্তার গতি প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল, সূর্য্য সেই সেই স্থানে খাল কাটিয়া প্রবাহ মুক্ত করিয়া দিলেন। এইরূপ বহুসংখ্যক খাল তাঁহার আদেশে খনিত হইয়াছিল।

বামদিকে সিন্ধু ও দক্ষিণে বিতস্তা প্রবাহিত ছিল; সূর্য্য এই দুই প্রবাহকে বন্যস্বামী নামক স্থানে সম্মিলিত করিয়া দিয়াছিলেন। কাশ্মীরের ইতিহাসলেখক কহ্লণ পণ্ডিতের সময় দ্বাদশ শতাব্দীতে এই সঙ্গম বিদ্যমান ছিল,—সূর্য্য ত্রিগ্রাম হইতে সিন্ধুনদের প্রবাহ ফিরাইয়া আনিয়া বিতস্তার সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছিলেন, এই কার্য্য কি প্রকার দুরূহ ও বিরাট্ ছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না,—পূর্ব্বে সিন্ধুনদের প্রবাহ যে দিকে ছিল, কহ্লণ পণ্ডিত তাহার চিহ্ন দেখিয়া ঠিক করিতে পারিয়াছিলেন,—বড় বড় গাছের নিম্নে নৌকা বাঁধিবার দড়ির চিহ্ন উক্ত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের সময়ও বিদ্যমান ছিল। সূর্য্য মহাপদ্মহ্রদের জলের প্রবাহ রুদ্ধ করিবার জন্য ৫৬ মাইল ব্যাপক একটি প্রস্তরের বাঁধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন

এবং এই দের সঙ্গে বিতস্তাকে আনিয়া মিশাইয়াছিলেন।

অনেক নিম্নভূমি তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে বন্যার জল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল,—সেই সকল স্থান অত্যন্ত উর্ব্বর হইয়াছিল। বহু স্থান ঘিরিয়া তৎকৃত প্রস্তরের বাঁধ অবস্থিত ছিল, সেই সকল স্থান "কুণ্ডল" আখ্যায় অভিহিত হইত। কহ্লণ পণ্ডিতের সময় পর্য্যন্ত কাশ্মীরের অনেক নদী শরৎকালে শীর্ণ হইয়া পড়িলে তন্মধ্যস্থিত সূর্য্যনির্ম্মিত প্রস্তরস্তম্ভের শীর্ষ দেখা যাইত। কথিত আছে, নন্দক গ্রাম বন্যামুক্ত হইলে তন্মধ্যে সূর্য্য-নিক্ষিপ্ত দীনারপূর্ণ থলিয়া-গুলির অনেকটা পাওয়া গিয়াছিল। মহা-পদ্মহ্রদের সঙ্গে বিতস্তার যে স্থলে মিলন হইয়াছিল, তাহার উপকূলে তিনি একটি সমৃদ্ধিশালী নগর স্থাপিত করিয়াছিলেন।

"সূর্য্যকুণ্ডল" নামক স্বপ্রতিষ্ঠিত একটি বৃহৎ পল্লী তিনি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি "সূর্য্যসেতু" বহুদিন বিদ্যমান ছিল। বহু গ্রাম তিনি কৃত্রিম খাল কাটিয়া উর্ব্বর করিয়াছিলেন, তিনি কাশ্মীর রাজ্যের যে সকল কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তাঁহার পূর্ব্বে কাশ্মীরে খুব উৎকৃষ্ট ফসল হইলেও এক খাড়ি ধান্যের দাম কোন কালেই ২০০ দীনারের কম হয় নাই, কিন্তু তাঁহার সময় প্রতি খাড়ি ৩৬ দীনার হইয়াছিল। তাঁহার যত্নে বন্যামুক্ত কাশ্মীর-দেশের বহু স্থানে পরবর্ত্তী রাজন্যবর্গ শত শত নগরী নির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিবরণ রাজতরঙ্গিণী হইতে সংগৃহীত হইল। ইহার সকল অংশ ঠিক ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া

গ্রহণ করা যায় কি না বলা যায় না—কিন্তু এই সকল বিবরণের অনেকাংশই যে সত্য এবং সূর্য্যের অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

এদেশে কোন নিম্নশ্রেণীর লোক আশ্চর্য্য প্রতিভা দেখাইলে তাহার উচ্চজাতিত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য অনেক প্রবাদ ও জনশ্রুতির সংঘটন হইয়া থাকে। "সূর্য্য" শুধু চণ্ডালগৃহে চণ্ডালী-কর্ত্তৃক পালিত হইয়াছিলেন, বস্তুতঃ তিনি ভদ্রঘরের সন্তান, তাঁহাকে তাঁহার পিতামাতা হাঁড়ির ভিতর পূরিয়া পথে ফেলিয়া গিয়াছিলেন—চণ্ডালী কুড়াইয়া পাইয়াছিল, ইত্যাদি অনেক কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, উহা কতদূর বিশ্বাস্য তাহা বলিতে পারি না।

আমাদের দেশে খালখনন যে এক সময়ে অতি বৃহৎ ও বিরাট্ চেষ্টায়

সমাহিত হইত, তাহার ইঙ্গিত প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। এমন কি ঐতিহাসিক কালের পূর্ব্বে ভগীরথের গঙ্গা আনিবার কথা, সগর-রাজের সমুদ্র সম্বন্ধে ও অগস্ত্য-মুনির বিন্ধ্যপর্ব্বত সম্পর্কীয় উপকথার ভিতরে কোন নিগূঢ় ঐতিহাসিক সত্য কাব্যমগ্ন হইয়া আছে কিনা কে বলিবে? কহ্লণ পণ্ডিত সূর্য্যকে বলদেব ও কশ্যপ হইতেও ভূমির উৎকর্ষ সাধনে অধিকতর কৃতকার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বলদেবের বিশ্ববিশ্রুত হলের কথা অবশ্য শুনিয়াছি, কিন্তু কশ্যপ কি করিয়াছিলেন?

যশস্করের বিচার

৯৩৯ খৃঃ অব্দে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া যশস্কর কাশ্মীর-রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইনি ৯ বৎসর ৬ মাস কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। দোষে গুণে যশস্কর একজন অনন্য-সাধারণ ভূপতি ছিলেন। বিচারকার্য্যে তাঁহার যশঃ কাশ্মীরে প্রবাদবাক্যের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার বিচারের দুইটি দৃষ্টান্ত আমরা নিম্নে প্রদান করিতেছি।

একদা এক নিষ্ঠাবান্ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন যে, তাঁহার অবস্থা এক সময় অতিশয় সমৃদ্ধ ছিল, ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া তিনি শেষে এরূপ বিব্রত হইয়া

পড়েন যে, তাঁহাকে স্বগৃহ এবং তৎসংলগ্ন ভূমি পর্য্যন্ত কোন ধনবান্ বণিকের নিকট বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সেই গৃহ-সীমায় অবস্থিত একটি কূপ ও তৎসংলগ্ন সোপানাবলী তিনি বিক্রয় করেন নাই, গ্রীষ্মাগমে যাহারা পর্ণ কিংবা ফুল সিক্ত রাখিতে ইচ্ছুক, তাহারা কূপ ও সোপান ভাড়া লইবে এবং তাহাতে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় অনায়াসে সংকুলান হইতে পারিবে, এই বিশ্বাসে ব্রাহ্মণ তাঁহার জায়াকে দেশে রাখিয়া বিদেশ-ভ্রমণে প্রবৃত্ত হন। ২৩ বৎসর পরে তিনি কাশ্মীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহার স্ত্রীর সুন্দর কান্তি মলিন হইয়া গিয়াছে; তিনি পরিচারিকার বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতেছেন।

তাঁহার এ দশা কেন হইল, সেই কূপ ও সোপানের আয়ে তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহ হইবার কথা, ইহা জিজ্ঞাসা করাতে ব্রাহ্মণরমণী বলিলেন, ব্রাহ্মণ বিদেশ-ভ্রমণে বহির্গত হওয়া মাত্র তাঁহাদের বাটীক্রেতা ধনশালী বণিক্ তাঁহাকে কূপ প্রভৃতির অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া বলপূর্ব্বক তাড়াইয়া দিয়াছিল।

এই সংবাদে ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বণিকের নামে অভিযোগ আনয়ন করেন, কিন্তু প্রতি বারেই বিচারকগণ তাঁহার ন্যায়সঙ্গত দাবী স্বীকার না করিয়া সেই মিথ্যাবাদী বণিকের অনুকূলে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন।

স্বীয় ইতিহাস এই ভাবে বর্ণনা করিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মহারাজ! আমি এই সকল বিচার বুঝি না, সেই

কূপ ও সোপানাবলী আমি কখনই বিক্রয় করি নাই, আপনি সদ্‌বিচারপূর্ব্বক আমাকে আমার ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির উপায় না করিয়া দিলে এই রাজদ্বারে আমি প্রায়োপবেশনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিব।”

রাজা বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিচারকমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া আনিলেন, এবং এই অভিযোগের সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা একবাক্যে রাজাকে জানাইলেন, বহুবার তাঁহারা এই ব্রাহ্মণের বিষয় তদন্ত করিয়া নিষ্পত্তি করিয়াছেন, বণিকের কথা সত্য, এই ব্রাহ্মণ নিতান্ত ধূর্ত্ত, ইহার শাস্তি হওয়া উচিত। রাজা স্বয়ং সেই গৃহের বিক্রয়পত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাহাতে কূপ ও সোপানাবলী সমেত বাটীবিক্রয়ের কথা লিখিত আছে।

তথাপি রাজা সেই ব্রাহ্মণের অভিযোগ সত্য বলিয়া মনে মনে সন্দিহান হইলেন। তিনি মনের ভাব গোপন করিয়া উপস্থিত সকলের সহিত নানারূপ আমোদজনক কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত রহিলেন, এবং ক্রীড়াচ্ছলে তাঁহাদের পরিহিত মণিরত্ন গ্রহণপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন, সেই স্থানে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অভিযুক্ত বণিক্‌ও উপস্থিত ছিলেন। রাজা অপরাপরের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিতেছিলেন, সেই ভাবে বণিকের অঙ্গুলি হইতে তাঁহার একটি অঙ্গুরীয়কও গ্রহণ করিয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন, সহসা হস্তপদ ধৌত করিবার ছলে রাজা সভাসদ্‌দিগকে তথায় অপেক্ষা করিতে আদেশ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন।

গৃহে প্রবেশ করিয়া রাজা সেই

অঙ্গুরীয়ক একজন দূতের হস্তে প্রদান করিয়া তাহাকে বণিকের বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন, দূতকে শিখাইয়া দিলেন সে যেন সেই অঙ্গুরী বণিকের বাটীর হিসাবপত্ররক্ষক কর্ম্মচারীর হস্তে প্রদান করিয়া বলে যে, বণিক্ তাহাকে সত্বর পাঠাইয়া দিয়াছেন; বণিকের অনুজ্ঞাক্রমে সেই ব্রাহ্মণের বাটী বিক্রয় করিবার তারিখ হইতে সমস্ত হিসাব পত্র এখনই তাহার নিকট দিতে হইবে। দূত রাজার আদেশানুসারে সেই বণিকের নাম করিয়া কর্ম্মচারীকে অঙ্গু-রীয়ক প্রদান করিল, এবং হিসাবপত্রের জন্য তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিল। কর্ম্মচারী প্রভুর করচিহ্ন অঙ্গুরী প্রাপ্ত হইয়া নিঃসন্দেহে সমস্ত হিসাবপত্র দূতের হস্তে অর্পণ করিল।

রাজা নিভৃত কক্ষে স্বয়ং সেই হিসাব

মনোযোগপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাহাতে বাটী ক্রয় সম্বন্ধীয় ব্যয়ের মধ্যে বিক্রয়-পত্রলেখক রাজকর্ম্মচারীকে ১০০০ দীনার প্রদানের উল্লেখ আছে। এরূপই কাগজ লেখার পারিশ্রমিক অতি সামান্য, তাহার তুলনায় ১০০০ দীনার অসম্ভব পরিমাণে অধিক। দলিল-লেখক রাজকর্ম্মচারীটীকে এত অধিক অর্থ কেন দেওয়া হইল এই সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া রাজা দলিলটি বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাহার এক স্থানে "র"কে "স"তে পরিণত করা হইয়াছে, দেবনাগরী অক্ষরে সামান্য পরিবর্ত্তন করিলেই "র"কে "স"তে পরিণত করা যায়, "সোপানকূপরহিত" কথার স্থলে "সোপানকূপসহিত" হইয়া গিয়াছিল। রাজা দলিল-লেখককে আনাইলেন, তাহাকে অভয়বাণী প্রদান

করিয়া সত্য বলিতে আদেশ করিলে, সে স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিল।

রাজা সেই দলিল সভাসদ্ ও বিচারক-মণ্ডলীর নিকট উপস্থিত করিয়া বণিকের দোষ প্রতিপন্ন করিলেন। বণিক্ কাশ্মীর হইতে নির্ব্বাসিত হইল এবং ব্রাহ্মণ তাঁহার বাটী ও ধনের অধিকারী হইলেন।

একদা মহারাজ যশস্কর সায়ং সন্ধ্যা সমাপনান্তে আহারে প্রবৃত্ত হইবেন এমন সময় দৌবারিক আসিয়া জ্ঞাপন করিল, জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করিতেছেন, তাঁহার কি অভিযোগ আছে, তাহা তিনি রাজসকাশে জ্ঞাপন করিবেন। দৌবারিক তাঁহাকে বুঝাইয়াছে যে, বিচারের সময় অতিবাহিত হইয়াছে; এখন রাজার সঙ্গে দেখা করিবার সময় নাই, কল্য যেন ব্রাহ্মণ রাজ-

সভায় উপস্থিত হইয়া অভিযোগের কথা নিবেদন করেন,--কিন্তু ব্রাহ্মণ কিছুতেই ছাড়িতেছেন না, তিনি তাহাকে বলিয়াছেন সে যদি রাজসকাশে আজই তাঁহার কথা না বলে, তবে তিনি রাজদ্বারে উপবাসী হইয়া থাকিবেন।

রাজা আহার না করিয়াই ব্রাহ্মণকে ডাকাইলেন, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিলেন, "মহারাজ, বহু স্থান পর্য্যটন করিয়া ১০০ স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহপূর্ব্বক আমি কাশ্মীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি, কাশ্মীর আমার স্বদেশ; শুনিয়াছিলাম আপনার শাসনে কাশ্মীর শান্তিপূর্ণ হইয়াছে, এ দেশে দস্যুতস্করের ভীতি নাই, গত রাত্রি আমি লবণোৎসের পার্শ্বস্থিত এক বৃক্ষনিম্নে যাপন করি, অতি প্রত্যূষে যখন উঠিয়া পথ চলিতেছিলাম, তখন আমার স্বর্ণমুদ্রার থলিয়া সমেত ক্ষুদ্র পুঁটুলিটি হস্তচ্যুত

হইয়া একটি কূপে পড়িয়া যায়, আমি অধীর হইয়া সেই কূপেই প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, কিন্তু চারি দিকের লোকজন সমাগত হইয়া আমাকে বাধা দেয়। সেই সমবেত লোকবৃন্দের মধ্যে বলিষ্ঠকায় সাহসী এক বণিক্ আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "যদি থলিয়াটি উদ্ধার করিয়া দিতে পারি তবে আপনি আমায় কি দিবেন ?"—আমি বলিলাম—"তাহা হইলে থলিয়াটি আপনারই হইল; আপনি তাহা হইতে আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই আমাকে দিবেন।" তখন সেই বণিক্ কূপনিম্নে অবতরণ করিয়া থলিয়াটি উদ্ধার করিল, এবং নিজে ৯৮টি স্বর্ণমুদ্রা রাখিয়া দুইটি মাত্র আমাকে প্রদান করিল। আমি মৌখিক যে সর্ত্ত করিয়াছিলাম, তাহার ফল এই দাঁড়াইল দেখিয়া সমবেত লোকবৃন্দ আমার নিন্দা করিতে

লাগিল। এই সর্ত্ত রাজবিধি অনুসারে অপরিবর্ত্তনীয়, স্থতরাং সকল লোক আমায় বলিল, ইহার আর কোন উপায় হইতে পারে না।” রাজা সেই বণিকের নাম ও আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে ব্রাহ্মণ কিছুই বলিতে পারিলেন না; শুধু তাহার মুখ দেখিলে চিনিতে পারেন, এই বলিলেন। রাজা ব্রাহ্মণকে আশ্বাস প্রদান করিয়া সে রাত্রে তাঁহাকে স্বগৃহে ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন, এবং পরদিন প্রভাতে লবণোৎসের বণিক্-বৃন্দকে আহ্বান করাইয়া আনিলেন, ব্রাহ্মণ তাহাদের মধ্যে একজনকে দেখাইয়া বলিলেন, এই সেই বণিক্।

সেই বণিক্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে ব্রাহ্মণ যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সে তাহার সকলই সত্য বলিয়া স্বীকার করিল এবং এ সম্বন্ধে রাজ-বিধি যে

তাহার অনুকূলে তাহাও গাইতে ছাড়িল না। ব্রাহ্মণ স্বয়ং সত্যপাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং সভাসদ্-বৃন্দ রাজা এই অভিযোগের কি বিচার করেন, দেখিতে উৎসুক হইয়া রহিলেন।

রাজা বিচারাসনে উপবেশনপূর্ব্বক ৯৮টি সুবর্ণমুদ্রা ব্রাহ্মণকে ও দুইটি মাত্র বণিক্‌কে প্রদান করিলেন। এই বিচারের সমর্থনে তিনি বলিলেন, "ব্রাহ্মণ একথা কহেন নাই যে, বণিক্ যাহাই দিবে, তিনি তাহাই গ্রহণ করিবেন।" ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন,—"আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই আমাকে দিবেন।" এখন বণিকের ইচ্ছা বা কামনা ৯৮টি স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করা, সর্ত্ত অনুসারে বণিকের যাহা ইচ্ছা তাহাই ব্রাহ্মণের প্রাপ্য হয়। লুব্ধ বণিক্ দুইটি স্বর্ণমুদ্রা পাইতে ইচ্ছা করে নাই, সে যাহা ইচ্ছা করিয়াছে (অর্থাৎ ৯৮টি

মুদ্রা) তাহা আমি ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলাম।

যদিও এই বিচারে রাজা সর্ত্তের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া শুধু কথার অর্থ দ্বারা অভিযোগের মীমাংসা করিলেন, তথাপি যখন কোন লোভপরায়ণ দুষ্ট ব্যক্তি অপরের সততার সুবিধা গ্রহণ করিয়া রাজবিধির বলে স্বীয় দুষ্ট অভিসন্ধি চরিতার্থ করিতে ইচ্ছা করে, তখন রাজবিধি লঙ্ঘন না করিয়া কৌশলক্রমে শব্দের অর্থগ্রহণ পূর্ব্বক যদি কোন সাধু ব্যক্তির সাহায্য করা যায়, তবে সে কার্য্য যে ন্যায়সঙ্গত হয়, তা... কেহ অস্বীকার করিতে পারে না।

আওরঙ্গজেব ও তাঁহার শিক্ষক

মোগল রাজত্বসময়ে বাদসাহ-পুত্র-দিগের শিক্ষকগণ বৃথা স্তোকবাক্য দ্বারা তাঁহাদের মনোরঞ্জন পূর্ব্বক স্বীয় স্বার্থ-সিদ্ধির উপায় খুঁজিতেন, এবং যে শিক্ষায় কুমারগণ রাজোচিত কর্ত্তব্যপালনের যোগ্য হইয়া উত্তরকালে প্রজাহিত সাধনে এবং রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণে সমর্থ হইতে পারেন, তদ্রূপ শিক্ষা প্রদান না করিয়া নানা প্রকার বৃথা পাণ্ডিত্য অর্জ্জনে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত রাখিতেন। সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের বাল্যকালে মোল্লাসেল নামক এই প্রকার এক শিক্ষকের হস্তে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। সাজাহান বাদসাহ ইঁহাকে কাবুলের সমীপবর্ত্তী কোনস্থানে বিস্তর ভূসম্পত্তি প্রদানপূর্ব্বক দরবার

হইতে অবসর দিয়াছিলেন। মোল্লা বৃদ্ধ বয়সে তথায় যাইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু দারাকে নিহত করিয়া আওরঙ্গজেব সম্রাট্ হইয়াছেন, সহসা এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার মনে অতিমাত্রায় লোভের সঞ্চার হইল, এবং তিনি ওমরার পদপ্রার্থী হইয়া দিল্লীশ্বরের দরবারে উপস্থিত হইলেন। সম্রাটের ভগিনী রোসনারা বেগম এবং কয়েকজন প্রধান রাজকর্ম্মচারী দ্বারা তিনি দরবারে অনুরোধ চালাইতে লাগিলেন। আওরঙ্গজেব প্রথমতঃ তাঁহার প্রতি কোন মনোযোগ প্রদর্শন করিলেন না, কিন্তু যখন দেখিলেন মোল্লা কোন প্রকারেই দরবার ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহেন, তখন একদা তাঁহাকে হাকিম উল্ মালিক এবং দানেশমন্দ খাঁ নামক সুপণ্ডিত ওমরাদ্বয়ের সম্মুখে বিনীতভাবে বলিলেন,

"শিক্ষক মহাশয়! আপনি কি ন্যায়তঃ ওমরার পদ দাবী করিতে পারেন? যদি আপনি আমাকে সৎশিক্ষা প্রদান করিতেন, তবে আপনাকে প্রার্থিত গৌরব প্রদান করা অপেক্ষা আমার অধিকতর আহ্লাদের বিষয় কি হইতে পারিত! কারণ আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি, যে শিক্ষক ছাত্রদিগকে সুশিক্ষা প্রদান করেন, তাঁহার নিকট ছাত্রের ঋণ পিতৃ-ঋণ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। আপনি আমাকে শিখাইয়াছেন ইউরোপ একটি নগণ্য দেশ। ফরাসী, হলণ্ড, পর্ত্তু-গাল প্রভৃতি দেশের সম্রাট্‌গণ দিল্লীশ্বরের অধীন করদ রাজা মাত্র, ইউরোপের সমস্ত সম্রাটের শক্তি একত্র করিলেও দিল্লীশ্বরের শক্তির তুলনায় তাহা অতি তুচ্ছ। আপনি আমাকে বলিতেন, দিল্লীশ্বর-গণ জগজ্জয়ী; তাঁহাদের ভয়ে চীন, মাঞ্চু-

রিয়া, পারস্য প্রভৃতি রাজ্যের অধিপতিগণ সর্ব্বদা কম্পিত। ইহাই কি ভূগোল ও ইতিহাসের প্রকৃত তত্ত্ব? আপনি যদি আমাকে সেই সকল স্থানের ভৌগলিক সংস্থান ও সীমা-নির্দ্দেশ করিয়া তদ্দেশবাসীদের আচার, ব্যবহার, রাজনীতি, সৈন্যবল ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন এবং কি কি কারণে সেই সকল রাজ্যের উন্নতি বা অবনতি হইয়াছে, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেন, তাহা হইলে আমার অশেষ উপকার সাধিত হইত। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ কি উপায়ে এই বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন, সেই ইতিহাস জানা আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল; কিন্তু তাহা না শিখাইয়া আপনি আমাকে আরবী ভাষার ব্যাকরণে পণ্ডিত করিবার চেষ্টায় আমার সময়ের অনেকটা নষ্ট করিয়াছেন। বাদসাহ-

পুত্রের ব্যাকরণে পণ্ডিত হওয়া জীবনের চরম লক্ষ্য নহে। আরবী ভাষার জন্য এতটা সময় নষ্ট না করিয়া আপনি যদি আমাকে হিন্দুস্থানের নানা প্রকার প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষার সহায়তা করিতেন, তাহা হইলে আমি উপকৃত হইতাম, কারণ সর্ব্বদা এতদ্দেশীয় লোকের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। আপনি আমাকে দর্শন শাস্ত্র শিখাইতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন; কতকগুলি জটিল কল্পনা ও দুর্ব্বোধ বাক্যের মধ্যে গূঢ় সত্য নিহিত রহিয়াছে, আপনি আমাকে এই ভরসা দিয়াছিলেন। কিন্তু যে দর্শন-পাঠে প্রকৃত নীতিজ্ঞান জন্মে ও হৃদয়ের দুর্নিবার প্রবৃত্তিগুলি দমন করিয়া লোক শান্ত ও সমাহিত ভাবে স্বীয় কর্ত্তব্যসাধন করিতে পারে, আপনি সেইরূপ দর্শন শিক্ষায় আমাকে দীক্ষিত করেন নাই।

রাজার প্রজাদের প্রতি কি কর্ত্তব্য এবং তাহাদেরই বা রাজার প্রতি কি কর্ত্তব্য, জানিলে আমার অনেক উপকার হইত। কিন্তু আপনি দিল্লীশ্বরের ক্ষমতা সম্বন্ধে নানাপ্রকার স্তোকবাক্য বলিয়া সত্য জানিবার পথে অন্তরায় উপস্থিত করিয়াছিলেন। আপনার শিক্ষায় যদি আমার প্রকৃত উপকার হইত, তবে অ্যারিষ্টটলের নিকট সেকন্দর বাদসাহ যেরূপ কৃতজ্ঞ ছিলেন, আমি আপনার নিকট তদপেক্ষা অধিকতর কৃতজ্ঞ থাকিতাম।”

আওরঙ্গজেব শিক্ষকের প্রতি কোন প্রকার সম্মানের ক্রটি না দেখাইয়া তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীর দোষ বিনীতভাবে দেখাইয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন।

স্বর্গীয় দিগম্বর সান্ন্যাল

পাবনার অন্তর্গত গাঁড়াদহ গ্রামে মাতুলালয়ে দিগম্বর সান্ন্যাল মহাশয় ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পৈতৃক নিবাসভূমি রাজসাহীর অন্তঃপাতী সোমনকলসী গ্রাম এবং ইঁহারা বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। পিতা ৺রাজীবচন্দ্র সান্ন্যাল মহাশয় একটি খুনের মোকদ্দমায় পড়িয়া পলাতক হন। সান্ন্যাল-পরিবার অতি বৃহৎ ছিল, এই দুর্ঘটনায় ইঁহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল। সহসা পরিবারস্থ অনেক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। নানারূপ বিপন্ন হইয়া রাজীবচন্দ্র সান্ন্যাল মহাশয়ের স্ত্রী জগদম্বাদেবী স্বগ্রামের ভদ্রলোকগণের সাহায্যপ্রার্থিনী হন। সাহায্য লাভ করা দূরে থাকুক,

তাঁহারা এই সুযোগে সান্যালদিগের অবশিষ্ট সম্পত্তিটুকু গ্রাস করিয়া বসেন। জগদম্বাদেবী চিরকালের জন্য দেশ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পিত্রালয়ে গমন করেন। মাতার নিষেধে দিগম্বর স্বীয় পৈতৃক গ্রামে আর জীবনে পদার্পণ করেন নাই। মাতুলবর্গ অবস্থাপন্ন ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা শিশু দিগম্বর ও তাঁহার মাতাকে তাদৃশ আদর দেখান নাই। তেজস্বিনী মাতা সেই গ্রামে পৃথক্ এক খানি ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই স্থানে দিগম্বরের পলাতক পিতা ছদ্মবেশে যাতায়াত করিতেন, ও অতি কষ্টে যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিয়া পাঠাইতেন, তদ্দ্বারা কায়ক্লেশে সংসার চলিয়া যাইত।

আঘাতে আঘাতে লৌহ ইস্পাত হয়, উপর্য্যুপরি বিপৎপাতে দিগম্বরের

চরিত্রবল ও মনের তেজঃ বৃদ্ধি পাইয়া ছিল। দিগম্বর গ্রামের পাঠশালায় পড়িতেন, ও তথায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য ছিলেন, কিন্তু পাঠশালার এক আনা বেতন চালাইতে পারিতেন না। কয়েক মাস ক্রমাগত বেতন না দেওয়াতে পণ্ডিত মহাশয় দিগম্বরকে একদিন বিশেষভাবে ভৎর্সনা ও বেত্রাঘাত করেন। দিগম্বর বলিলেন, "গুরুমহাশয়, আমি কোনরূপেই এক আনা বেতন চালাইতে পারি না, আমাদের দুইটি সন্ধ্যা ভাতই চলে না" এই বলিতে বলিতে শিশু দিগম্বর হৃদয়াবেগে কাঁদিয়া ফেলিলেন। পণ্ডিত মহাশয় তদবধি তাঁহার মাহিয়ানা লইতেন না।

এই অবস্থায় তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ৪৲ টাকা বৃত্তিলাভ করেন, এবং পড়িবার জন্য

বহরমপুরে উপস্থিত হন। এখানে গাঁড়াদহনিবাসী প্রেমলাল নাগ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দিগম্বরকে আশ্রয় দান করেন। দিগম্বর বৃত্তির চারিটাকা মাতাকে পাঠাইয়া দিতেন। স্কুলে বিনা বেতনে পড়িতেন এবং প্রেম বাবুর বাসায় দুটি খাইতে পাইতেন। কিন্তু এ সুখ তাঁহার ভাগ্যে বেশী দিন রহিল না। প্রেম বাবুর বাসায় থাকিয়া অনেকগুলি ছাত্র পড়াশুনা করিত। তন্মধ্যে বাবুর নিতান্ত আত্মীয় একটি ছাত্রপ্রবর চৌর্য্য অপরাধে ধৃত হওয়ায় নাগ মহাশয় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বাসার সমস্ত ছাত্র-কেই তাড়াইয়া দেন। কিন্তু কেবল মাত্র দুঃখের সহিত দিগম্বরকে ব[illegible]ন, "দিগম্বর, শুধু তোমাকে অন্যত্র যাইতে বলিতে আমার বড় কষ্ট হইতেছে, তুমি বড় ভাল ছেলে, কিন্তু কি করিব, আমি

এরূপ অবস্থায়ই পড়িয়াছি যে, একজনকে তাড়াইয়া অপর কাহাকেও আমার রাখিবার উপায় নাই।”

অন্যান্য বালক যে যাহার স্থানে চলিয়া গেল, নিঃসহায় দিগম্বর স্কুলের পুস্তক কয়েকখানি লইয়া প্রাতে বাহির হইয়া গেলেন, ও এদিক্ সেদিক্ ঘূরিয়া স্কুলের সময় স্কুলে উপস্থিত হইলেন। যথাসময়ে স্কুল ছুটি হইল। সারাদিন উপবাস করিয়া দিগম্বর নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বেলা অবসানপ্রায়, দিগম্বর চতুর্দ্দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতে লাগিলেন, কে তাঁহাকে আশ্রয় দিবে? এতদবস্থায় শীর্ণ ও শুষ্কমুখে তাঁহাকে রাস্তায় বেড়াইতে দেখিয়া তাঁহার একজন অবস্থাপন্ন সহপাঠী তাঁহাকে বলিল, “দিগম্বর, তুমি স্কুলের পর বাসায় যাও নাই? তোমায় এমন দেখাইতেছে

কেন? দিগম্বর নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কষ্টের সহিত অশ্রু সংবরণ করিয়া তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলেন। সহপাঠী শুনিয়া দুঃখিত হইলেন এবং বলিলেন—"তোমার আর কোন কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না, এস আমাদের বাড়ীতে থাকিবে।" বন্ধু অতি যত্নে তাঁহাকে হাত ধরিয়া নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে বিশেষ আদরে তথায় রাখিলেন। দিগম্বরেরও থাকিবার সমস্ত সুবিধাই হইল।

কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই দিগম্বর বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার সহাধ্যায়ী অতি কুচরিত্র। কোন একদিনের বিশেষ একটি ঘটনায় দিগম্বর উহার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়া গৃহের জনৈক ভৃত্যকে সেই ঘটনার গূঢ় কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে

সে এক জঘন্য অভিনয়ের বৃত্তান্ত তাঁহাকে অবগত করাইল। সহাধ্যায়ী বন্ধুপ্রবরের এই কীর্ত্তি অবগত হইয়া দিগম্বর দুঃখিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট যাইয়া বলিলেন "দেখ ভাই আমি অতি গরিবের ছেলে, আমার ভাত জোটে না। তোমরা বড় মানুষ, তোমাদিগের সকলই সাজে। তবে যে পথে চলেছ, সে পথ ভাল নহে, উহা ত্যাগ কর। আমি বড় ভীত হইয়াছি, এখানে থাকা আমার সাহসে কুলায় না; আমায় ক্ষমা করিও, আমি চলিলাম।" বন্ধুবরের নানারূপ অনুনয় বিনয় উপেক্ষা করিয়া দিগম্বর আহারাদি না করিয়াই পুঁথি কয়েকখানি লইয়া আবার রাস্তার উপর দাঁড়াইলেন। কে কোথায় স্থান দিবে, আহার দিবে, এ চিন্তা বালকের মনে একবারও হয় নাই; যে ধর্ম্মনীতিপ্রসূত ভীতি ও সাবধানতা

তাঁহার চরিত্রটীকে সমাজের ভূষণস্বরূপ করিয়াছিল, তাহারই বলে তিনি এক মুহূর্ত্তও ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া বিপদ্ ও দুঃখের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক সেই বিলাসের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পড়িলেন। সারাদিন স্কুলে পড়া-শুনা করিয়া অনাহারে অবসন্ন অবস্থায় দিগম্বর সন্ধ্যাকালে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে যাইয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমি একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছাত্র। কোথায়ও থাকিতে স্থান না পাইয়া আসিয়াছি। যদি মহাশয় দয়া করিয়া বাসায় আশ্রয় দেন।" অনুসন্ধানে গৃহস্বামী জানিলেন, দিগম্বর স্কুলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ছেলে, সুতরাং যত্নের সহিত তাঁহাকে বাসায় রাখিলেন। এ বাসায় আহারের বড় অসুবিধা ছিল, রাত্রি ১২টা কি ১ টার সময় রন্ধন হইত। বাসার

অপরাপর সকলে নিজ পয়সায় খাবার খাইতেন। দিগম্বর কিছুই খাইতেন না, পরন্তু বালক ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া রাত্রি ১০ টার মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িতেন। কেহ তাঁহাকে জাগাইত না, এ অবস্থায় অনেক সময় রাত্রিকালে দিগম্বরকে উপবাসে যাপন করিতে হইত। যে হাঁপানিকাশিতে দিগম্বর ভবিষ্যতে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, এই উপবাসজনিত কষ্টেই তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল। একদিন বালক স্কুল হইতে আসিয়া ঝিকে বলিল, "ঝি, আজ আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, আমায় কিছু খাবার দিতে পার?" ঝি বলিল, "কি দিব, বাছা, কিছুই নাই, রাত্রে রান্না হইলে খাইবে।" অনাহারে শুষ্কমুখে পড়িতে পড়িতে দিগম্বর ঘুমাইয়া পড়িলেন, কেহ তাঁহাকে জাগাইয়া খাওয়াইল না। পর

দিন প্রাতে দিগম্বর দাঁড়াইতে পারেন নাই,—ঝিকে বলিলেন, "আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, আমায় চারিটি চাল দেও, আমি রান্না করিয়া খাই।" ঝি চারিটি চাউল দিল, দিগম্বর তাহা চড়াইয়া দিয়া মনে করিলেন, সেই বাড়ীর গাছে বড় বড় করমূচা হইয়াছে, তাহার কয়েকটা ভাতে দিলে খাইতে পারিবেন। এই মনে করিয়া করমূচা ভাতে পাক করিলেন। আহার করিতে বসিয়া ঝির নিকট এক-টুকু লবণ চাহিলেন। ঝি বলিল, "নুন বাসায় নাই, বাজার হইতে আনিতে দেরি হইবে।" দিগম্বর ভাত খাইতে আরম্ভ করিয়া দেখিলেন, লবণাভাবে ভাত অত্যন্ত বিস্বাদ হইয়াছে। নুন পাইবেন না জানিলে তিনি করমূচা ভাতে দিতেন না। এখন আর খাইতে পারেন না। উপবাসী দিগম্বরের ভাত মুখে

তুলিতে চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। ভাত আর খাওয়া হইল না। সেই দিন বড় কষ্ট হইল, দিগম্বর পুঁথি কয়েকখানি লইয়া আবার তাঁহার প্রথম আশ্রয়, মহানুভব প্রেমলাল নাগ মহাশয়ের নিকট যাইয়া কাতরভাবে বলিলেন, “আমার কোন স্থানে থাকিবার স্থবিধা হইল না, আমাকে আশ্রয় দিন্।” প্রেম-বাবু সাশ্রুচক্ষে দিগম্বরকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “বাছা, তোমাকে তাড়াইয়া দিয়া আমি বড় অনুতপ্ত হই-য়াছি, তুমি আমার এইখানেই থাক।” এই অবধি দিগম্বরের বাসস্থানের কষ্ট দূর হইল।

দিগম্বর এই সময় পূজার ছুটিতে এক বার মাতুলালয় গিয়াছিলেন। মাতুল মহাশয় এক দিন তাঁহাকে বলিলেন, “দিগম্বর, কল্য প্রাতে তোমায় লুচি

ভাজিতে হইবে, সকাল সকাল স্নান করিয়া প্রস্তুত হও।" প্রাতে একটুকু মেঘ হওয়াতে রৌদ্র উঠে নাই, দিগম্বর কাপড়খানি পরিয়া স্নান করিয়া চাদর-খানি পরিলেন ও কাপড় শুকাইবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রৌদ্র না উঠাতে বিলম্ব হইতে লাগিল, দেরি দেখিয়া মাতুল মহাশয় দিগম্বরকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। দূর হইতে মাতুলকে দেখিতে পাইয়া দিগম্বর অতি তাড়াতাড়ি অর্দ্ধসিক্ত কাপড়খানি পরিয়া ফেলিলেন, এবং মাতুল মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। মাতুল মহাশয় কাপড়ে হাত দিয়া বুঝিলেন, উহার অনেকটাই শুকায় নাই। তিনি তাঁহাকে ভিজা কাপড় ত্যাগ করিতে বলিলেন। দিগম্বর নিরুত্তর রহি-লেন; মাতুল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ক'খানি কাপড়?" বারংবার জিজ্ঞাসা

করাতে দিগম্বর বলিলেন, "আমার এক খানি কাপড় ও একখানি চাদর।" ইহাই তাহার স্কুলে যাওয়ার ও সর্ব্বদা পরিবার সম্বল, এবং ইহাতেই তাঁহার বৎসর কাটে। মাতুল মহাশয় হৃদয়াবেগে দিগম্বরের গলা জড়াইয়া শিশুর ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন এবং তখনই নিজে বাজারে যাইয়া ৪ জোড়া কাপড় এবং ৪ জোড়া চাদর কিনিয়া তাঁহাকে দিলেন। দিগম্বর বাবু বলিতেন, "সেই অবধি আমি কাপড়ের কষ্ট পাই নাই।"

এই দরিদ্র কিন্তু দুঃখসহিষ্ণু বালকের অদম্য অধ্যবসায়ের বিষয় কি বলিব, এফ্ এ পর্য্যন্ত তিনি যত পুস্তক পড়িয়াছেন, তাহার এক খানিও ছাপা পুস্তক নহে। ছাপা বই কিনিবার তাঁহার অর্থসংস্থান ছিল না। দিগম্বর নিজ হাতে সমস্ত পাঠ্যপুস্তক নকল করিয়া লইয়াছিলেন।

বহু কষ্টে লিখিত বহুবর্ষের পুঁথিগুলি তিনি অতি যত্নে রাখিয়াছিলেন। ইউ-ক্লিডের জ্যামিতি এবং সাহিত্য, ভূগোল প্রভৃতি সকল পুস্তকই তিনি হাতে লিখিয়া লইয়াছিলেন। উদীয়মান প্রতিভাকে দারিদ্র্য আরও বর্দ্ধিত করিয়া দেয়, দিগম্বরের জীবনে আমরা সর্ব্বদা ইহা লক্ষ্য করিবার সুবিধা পাইয়াছি।

তিনি যখন প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেন, তখন সহপাঠিগণ তাঁহাকে জুতা পরিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। ক্লাসের সকল ছেলেরই পায় জুতা, দিগম্বর তাঁহাদের সাগ্রহ অনুরোধ অর্থাভাবে রক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু প্রথম শ্রেণীতে উঠিলে সহপাঠিগণ-বিশেষ পীড়ন আরম্ভ করিলেন ও চাঁদা তুলিয়া তাঁহাকে জুতা কিনিয়া দিবেন এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। অগত্যা

দিগম্বর ৷৷৵০ আনা মূল্যে এক জোড়া জুতা কিনিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু দিগম্বর বলিয়াছেন, তিনি সেই জুতা দুই এক দিন পরিয়া আর পরিতে পারেন নাই —'আমি জীবনে জুতা ব্যবহার করি নাই, প্রথমে জুতা পরিয়া পায়ে বড় বড় ফোস্কা পড়িল, তাহা সারিতে ২৷৩ মাস লাগিয়াছিল।”

এই আখ্যায়িকার সমস্ত বৃত্তান্তই আমরা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। যখন এগুলি আমাদিগকে বলিয়াছেন, তখন তাঁহার আয় রাজার মত। নিজের পূর্ব্ব জীবনের দৈন্যের বিষয় উল্লেখ করিতে সাংসারিক বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তিগণ লজ্জাবোধ করেন—কিন্তু দিগম্বর হীন অবস্থাতে যে রূপ, অবস্থাপন্ন হইয়াও ঠিক সেইরূপ ছিলেন। তাঁহার সারল্য দৈন্য ও একান্ত আড়ম্বরশূন্যতা, এই জন্যই তাঁহার বন্ধু-

বর্গের অকপট শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল।

শৈশব ও প্রথম যৌবনে দিগম্বর অন্ন বস্ত্রের কষ্ট পাইয়াছিলেন, এজন্য তিনি শেষে অন্নবস্ত্র দানে এরূপ মুক্ত-হস্ততা দেখাইয়া গিয়াছেন। যদি শুনিতেন, কেহ খায় নাই, কাহারও পরিবার কাপড় নাই, দিগম্বর তখন উতলা হইয়া পড়িতেন, সে কথা আমরা পরে লিখিব।

দিগম্বর ৪৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই বৃত্তি ৪ বৎসরের জন্য ছিল, কিন্তু তিনি তিন বৎসরে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পাছে পীড়া কিংবা অন্য কোন বাধায় এক বৎসর নষ্ট হয়, তাহা হইলে পড়া চলিবে না এই আশঙ্কায় এক বৎসর হাতে রাখিয়া দিগম্বর

পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এণ্ট্রান্স 'পরীক্ষা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ১০৲ টাকা বৃত্তি পাইলেন, এখন এক বৎসরের জন্য তাঁহার ছাত্রবৃত্তি ৪৲ টাকা এবং এণ্ট্রান্সের বৃত্তি ১০৲ টাকা একুনে ১৪৲ টাকা মাসিক বৃত্তি পাওয়ার কথা; কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বলিলেন, "দুই বৃত্তি এক সঙ্গে পাওয়ার নিয়ম নাই, ৪৲ টাকার বৃত্তি রহিত হইবে।" কয়েক-জন প্রফেসার মধ্যে পড়িয়া প্রিন্সিপ্যাল সাহেব দ্বারা এ বিষয়টি ডিরেক্টর এটকিন্-সন্ সাহেবের বিচারাধীন করাইলেন। ডিরেক্টর আদেশ করিলেন, এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন নিয়ম নাই, সুতরাং এ ছাত্রটি দুই বৃত্তিই পাইবে। ভবিষ্যতে কেহ এ ভাবে দুই বৃত্তি পাইবে না, এ বিষয়ে তখনই সারকুলার হইল। এই ১৪৲ টাকার সমস্তই তিনি মাতাকে পাঠাইতেন।

ইহার কিছু পূর্ব্বে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। ছদ্মবেশধারী পিতা দিগম্বর বাড়ী আসিয়াছে শুনিয়া তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। দিগম্বরকে পাইয়া তিনি কত সুখী হইয়াছিলেন,—কিন্তু সেই দিনই তাঁহাকে সন্ন্যাস রোগে ইহসংসার পরিত্যাগ করিতে হয়। দিগম্বরের নিজের মৃত্যুও এইরূপ শোচনীয় ভাবে ঘটিয়াছিল, তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

তিনি ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষার সময় জ্বররোগে আক্রান্ত হন, তথাপি কোনও রূপে পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইলেন, অঙ্কের পরীক্ষার দিন কোন সহাধ্যায়ী বন্ধুপ্রবর দিগম্বরের লিখিত উত্তরগুলি চুরি করিয়া এক বিভ্রাটের অভিনয় করেন, এইরূপ নানাকারণে পরীক্ষায় আশানুরূপ ফললাভ হইল না। যদিও পরীক্ষায় ভালরূপ উত্তীর্ণ হইলেন, তাঁহার ভাগ্যে

এবার বৃত্তিলাভ ঘটিল না। পরীক্ষার পর দিগম্বরের মাতাঠাকুরাণী তাঁহাকে চাকরি লইতে বাধ্য করিলেন। ৬০৲ টাকা বেতনে তিনি বহরমপুর স্কুলের হেডমাষ্টারী পদ গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, এই ৬০৲ টাকা বেতনে চাকরি করার কালে তিনি যেরূপ সুখী ছিলেন, জীবনে আর সেরূপ সুখ ঘটে নাই। এক বৎসর মাত্র তিনি মাতৃপাদ-পদ্ম পূজা করিতে পাইয়াছিলেন, মাতার কথা কহিতে বৃদ্ধকালেও তাঁহার কণ্ঠ স্নেহে কাতর হইত, তিনি শিশুর মত হইয়া যাইতেন। এক বৎসর পরে মাতৃবিয়োগ হইলে, তিনি ওকালতি পাশ করিয়া প্রথমতঃ ২৪ পরগণায় আসিলেন; তথায় হাপানি রোগের অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায়, দিগম্বর ফরিদপুরে ওকালতী আরম্ভ করিলেন।

তখন ফরিদপুর নূতন জেলা হইয়াছে, মোক্তারগণের অসাধারণ পসার এবং প্রতিপত্তি। বড় বড় উকিলগণও মোক্তার-বর্গকে তোষামোদ ও যথেষ্ট মর্য্যাদা প্রদান করিয়া স্বীয় পসার অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। অনেকস্থলেই মোক্তারগণ উকিলদিগের প্রাপ্য হইতে শতকরা ৭৫৲ টাকা কাটিয়া রাখিতেন। নবযৌবনদৃপ্ত, সাহসী ও প্রতিভাশালী দিগম্বর নানারূপ বিঘ্ন ও শত্রুতা দলিত করিয়া অতি শীঘ্র উকিল-গণের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথমতঃ প্রতিপক্ষীয়গণের বাধায় তিনি ফরিদপুর ছাড়িয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, শুধু মোক্তারবর্গ নহে, বৃদ্ধ উকিলগণ পর্য্যন্ত দিগম্বরকে অপদস্থ করিয়া তাড়িত করিবার জন্য বিশেষ যত্নপর ছিলেন। কেহ কেহ হাকিমগণের নিকট বিচারালয়ে এই ভাবে বক্তৃতা করিতেন, "হুজুরের

অবিদিত কোন আইন নাই, এই বালক হুজুরকে আইন শিখাইতে আসিয়াছে, ইহার প্রত্যেক কথা ধৃষ্টতাপূর্ণ। হুজুর ইহাকে কখনই প্রশ্রয় দিবেন না।” কিন্তু ষড়যন্ত্র বিফল হইল, ফরিদপুরে তাঁহার সময়ে যে সকল হাকিম আসিয়াছেন, প্রত্যেকে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গে এরূপ আইনজ্ঞ প্রতিভাশালী উকিল আর নাই। নজির প্রদর্শনে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তখনকার শ্রেষ্ঠ উকিলগণের নিকট শুনিয়াছি—দিগম্বর বাবু নথিপত্র দেখিয়া মোকদ্দমা এরূপ নূতন ভাবে দাঁড় করিতেন, তাহা আইনের এরূপ সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হইত যে, প্রতিপক্ষের উকিলগণ তাঁহাদের অচিন্তিত এক নূতন মূর্ত্তিতে মোকদ্দমাটি দেখিয়া একবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতেন এবং হাকিমবর্গ

তাঁহারই প্রদর্শিত পথে পরিচালিত হইতেন। গৃহে তিনি মৃদু ও কমনীয় স্বভাবের জন্য খ্যাত ছিলেন। তাঁহার কথা সলজ্জ সম্ভ্রমে একেবারে বাধ বাধ হইয়া যাইত, বিনয়পূর্ণ ভাষা অতিশয় ভদ্রতায় কণ্ঠে যেন বিলীন হইয়া যাইত; কিন্তু বিচারালয়ে এই মৃদু স্বভাবাপন্ন ব্যক্তিটি সিংহবিক্রান্ত হইতেন। তিনি জজ এবং সবজজের আদালত ভিন্ন কখনও ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ কিংবা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারালয়ে যান নাই। প্রচুর অর্থের প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া তিনি স্বীয় সম্মান অপ্রতিহত রাখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অপর্য্যাপ্ত অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ সত্ত্বেও তিনি মফঃস্বলে যাইতে স্বীকৃত হন নাই। বোধ হয়, তাঁহার ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্যই এই সকল সুযোগ তাঁহাকে প্রত্যা-

খ্যান করিতে হইয়াছে। তিনি দরিদ্র ও অক্ষম ব্যক্তির কার্য্য অনেক সময় অর্থ গ্রহণ না করিয়া নিজে নানারূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু সম্পন্ন মক্কেলের নিকট তাঁহার দাবী এক কপর্দ্দকও হ্রাস করেন নাই। তাঁহার দাবী এত বেশী ছিল যে, তাহা একরূপ নিষেধাত্মক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ তাঁহার কার্য্যের অবধি ছিল না। তিনি যাহার কার্য্য হাতে লইতেন, প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া তাহা সুসম্পন্ন করিতেন। তাঁহার হাতে মোকদ্দমাটি দিতে পারিলে মক্কেল একবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারিত। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ইহা কাহারও অবিদিত নহে, কাঞ্চনপুরের সাহাদের মোকদ্দমার জন্য অপরিমিত পরিশ্রমই তাঁহার হঠাৎ মৃত্যুর কারণ। প্রাতঃ-

কালে তিনি কাহারও সহিত বাক্যব্যয় করিতেন না। যাঁহার ভদ্রতার খ্যাতি দেশব্যাপক ছিল, তিনি কর্ত্তব্য এবং ভদ্রতার সীমা উল্লঙ্ঘন না করিয়া উভয় বিষয়েরই কিরূপ আদর্শ হওয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন।

দিগম্বর বাবু প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। জেলা কোর্টে এত অর্থ উপার্জ্জন অল্পসংখ্যক উকিলের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। যে বৎসর তাঁহার মৃত্যু হয়, সে বৎসর তাঁহার অন্যূন ৫০ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল। মাত্র জজ ও সবজজ কোর্টে যাইয়া তিনি এই রাজ-যোগ্য উপস্বত্ব লাভ করিতেন। কিন্তু তিনি অর্থলোভী ছিলেন না, অর্থ তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। কর্ত্তব্য ও সুনীতিই তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিল। একবার এক মক্কেলের কাজের জন্য তিনি ২৫০০৲.

টাকা অগ্রিম গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁহার বন্ধু উকিল হরবিলাস বাবু আসিয়া বলিলেন, "দিগম্বর বাবু, আমার একটি নিজের কার্য্যে আপনাকে এই দুই তিন দিন খাটিতে হইবে।" দিগম্বর বাবু ইহার পূর্ব্বেই অন্যের মোকদ্দমার ভার গ্রহণ করিয়া অর্থ লইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে বন্ধুকে আপ্যায়িত করিতে তাঁহার ত্রুটি হইল না। তিনি হরবিলাস বাবুর অবৈতনিক কার্য্য লইলেন এবং বলিলেন, "আমরও একটি কাজ আপনার করিতে হইবে।" গোপনে মক্কেলকে ডাকিয়া ২৫০০৲ টাকা ফিরাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "আমি তোমাদের মোক-দ্দমার সমস্ত পরিশ্রম নিজে করিয়া উপ-দেশ দিব, হরবিলাস বাবু তোমাদের কাজ করিবেন; ইঁহাকে ৫০০৲ টাকা দিলেই হইবে। আমার উপদেশাদির

সুবিধা পাইবে, অথচ তোমাদের ২০০৲
টাকা বাঁচিয়া যাইবে।" তিনি বন্ধুদের
জন্য এইরূপ ত্যাগপরায়ণ ছিলেন।
বিচারালয়ে স্বীয় মোকদ্দমার কথা
ব্যতীত হাকিমের মনস্তুষ্টি সাধন জন্য
কখনও একটী কথাও বলেন নাই। এক
বার জজ পস্‌ফোর্ড সাহেবের সঙ্গে
তাঁহার একটুকু বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াছিল।
তদবধি তিনি তাঁহার এজলাসে আর যান
নাই। সেই কোর্টের মোকদ্দমার জন্য
মক্কেলগণ তাঁহাকে যে কয়েক সহস্র
টাকা অগ্রিম দিয়াছিলেন, তাহা তিনি
ফিরাইয়া দেন। পস্‌ফোর্ড দীর্ঘকাল
ফরিদপুরে ছিলেন, এই সময়ের জন্য
দিগম্বর বাবু শুধু সবজজের আফিসে
কাজ করিয়াছিলেন, অথচ তাঁহার আয়
যেরূপ সেরূপই ছিল। তাঁহার ওকালতী
ব্যবসায়ে মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত আমরা অনেক

জানি, সে সকল এখানে বলিবার প্রয়ো-
জন নাই। কিন্তু তাঁহার দেবপ্রতিম হৃদয়ের
যে দয়া চন্দ্ররশ্মির ন্যায় জীর্ণ কুটীর ও
কাঙ্গালের ঘরে পড়িয়া শোভা পাইয়াছে,
এবং তাঁহার যে উন্নত চরিত্রমাধুর্য্য অমর
বর্ণে আমাদের স্মৃতিতে অঙ্কিত রহিয়াছে,
তাহাই এ প্রবন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তিনি দাড়িম, আম, আক, জাম
প্রভৃতি ফলের বৃক্ষ বাটীর ভিতরে রোপণ
করিতে দিতেন না। তাঁহার বাসার বাহিরে
রাস্তার ধারে যে বৃক্ষগুলি ফলবান্ হইত
দর্শকগণ ইচ্ছাক্রমে তাহা হইতে ফল
পাড়িয়া লইয়া যাইত। আম্র ও জাম বৃক্ষ-
শাখা সকল অপরিচিত শিশুমণ্ডলীর পদ-
ভরে সর্ব্বদা কম্পিত হইত। তিনি তাহা
দেখিয়া সুখী হইতেন, এবং বলিতেন,
"যে ফলটি যাহার ভাল লাগিবে,
তাহার সেবায় তাহা অর্পিত হইলে

কত আনন্দের বিষয়! ভগবান্ আমাদিগকে এমন অবস্থায় রাখিয়াছেন যে, আমাদের কিনিয়া খাইতে কষ্ট হয় না।”

তাঁহার তিনটি ছাগ ছিল, কাছারি হইতে আসিলে তাহারা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত। সেই পুণ্যচিত্র ঋষির আশ্রমে একটি দৃশ্যের মত দেখাইত। তাঁহার বৈকালে সামান্য জলখাবারের অধিকাংশ তাহাদিগকে দিয়া অল্প মাত্র অবশিষ্টাংশ নিজে খাইতেন। এ দিকে বিপুলদেহ অপর্য্যাপ্তরূপে সুস্থ ও বলিষ্ঠ ১৬ জন ঘরামি, ৮ জন বেহারা এবং বহুসংখ্যক ভৃত্য লুচি মণ্ডা ও সন্দেশের স্তূপ রাজ-ভোগের জিনিষ প্রত্যহ খাইত। তিনি তাহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতেন। একদা অসুস্থতানিবন্ধন ডাক্তারের উপদেশে সুপ প্রস্তুত করিবার জন্য একটি পাঁঠা কিনিয়া আনিয়া বাড়ীতে গোপনে কাটা

হয়। ইহা জানিতে পারিয়া দিগম্বর বাবু যেরূপ বিরক্তি দেখাইয়াছিলেন, তাহা কেহ কখনও দেখে নাই। তিনি বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন ও অতি বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন, "অন্যে যাহা বিবেচনা করে করুক, আমি বড় দুঃখী, এই দুঃখময় তুচ্ছ জীবনরক্ষার জন্য যে ছুটিয়া খেলিয়া বেড়ায়, তাহার প্রাণ নষ্ট করিব? তাহার অগ্রে আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

তাঁহার ভৃত্য, ঘরামি, বেহারা প্রভৃতিকে সর্ব্বদা বলিতেন, "তোমাদের দেশে পরিবারবর্গের যেন খাইবার ও পরিবার কষ্ট না হয়"—অনেক সময়েই তিনি তাহাদের পারিবারিক অভাব মোচনের জন্য টাকা পাঠাইয়া দিতেন। সে টাকা তাহাদের বেতন হইতে কাটা যাইত না। তাঁহার

বাড়ীতে বৎসরে অনেক টাকার কাপড় ক্রয় করা হইত ; তিনি অনেক সময়ই বিশেষতঃ গ্রহণাদি উপলক্ষে দরিদ্রদিগকে বস্ত্রদান করিতেন। তাঁহার বাড়ীতে যে ব্যক্তি কোনও কালে কয়েক দিনের জন্যও থাকিয়া গিয়াছে, পূজার সময় তাহাকেও বস্ত্রাদি পাঠাইয়া দিতেন। বৎসর বৎসর এই প্রভূত বস্ত্র ফরিদপুরের চন্দ্রকুমার নাথ নামক বস্ত্রবিক্রেতার দোকান হইতে আনীত হইত। অথচ তাঁহার লোক সর্ব্বদা কলিকাতায় যাতায়াত করিত। ফরিদপুরে না কিনিয়া এই কাপড়গুলি কলিকাতা হইতে আনিলে তাঁহার অনেক টাকা বাঁচিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু তিনি স্থানীয় দোকানদারগণের আশা নষ্ট করিতে সম্মত ছিলেন না। তিনি চিরদিনই খড়ের ঘরে জীবন কাটাইয়া গেলেন। তাঁহার দুই তিন মাসের আয়েই পাকা

বাড়ী হইতে পারিত। বহুসংখ্যক সুবৃহৎ খড়ের ঘর যুক্ত বাড়ীতে অগ্নি ও চোরের ভীতি সহ্য করিয়া তিনি আজীবন অসুবিধা ভোগ করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর বৎসর তাঁহার আয় ৫০০০০৲ টাকা হইয়াছিল, অথচ হঠাৎ মরিয়া গেলেন পরে সিন্ধুকে মাত্র ২০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। এরূপ অজস্র ব্যয়ী হইয়াও তিনি নিজের সুখের জন্য এক কপর্দ্দকও খরচ করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "কোটাবাড়ী দিলে ঘরামিগুলি উঠাইয়া দিতে হইবে, কোটাবাড়ীর কথা শুনিলে ইহাদের মুখ কাঁদ কাঁদ হয়, আমি ইহাদের বহুদিন হইতে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছি।"

এই স্বীয় সুখচিন্তাবর্জ্জিত একান্ত অনাড়ম্বর ব্যক্তি দরিদ্রদিগকে দান করিবার কালে মহারাজের ন্যায় মুক্ত

হস্ততা দেখাইয়াছেন। বৎসর বৎসর অসংখ্য দরিদ্র তাঁহার বাড়ীতে খাইতে পরিতে পাইত। সেই মহোৎসব-চিত্র-উদ্ভাসিত, দয়াপূর্ণ, দীনদুঃখীর অযাচিত বন্ধু দিগম্বরের মূর্ত্তি যিনি দেখিয়াছেন, তাঁহার মানসপটে তাহা চিরকাল অঙ্কিত থাকিবে। অসংখ্য দরিদ্রমণ্ডলী যেন তাঁহার বড় এক পরিবার, তিনি যেন তাহাদের ভরণপোষণের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। একান্ত অশক্ত শরীরে তিনি নিজে অনেক সময়ে তাহাদিগকে পরিবেশন করিতেন, ও কোন দীনদুঃখীর নিতান্ত জীর্ণশীর্ণ মূর্ত্তি এবং খাইবার আগ্রহ দেখিলে সাশ্রুনেত্র হইতেন। এ জীবনে সেই দেবমূর্ত্তি ভুলিবার নহে।

তাঁহার বিনয় ও দৈন্যের সীমা ছিল না। একজন সামান্য ব্যক্তি তাঁহার

বাড়ীতে গেলেও তিনি নিজে উঠিয়া হাত ধরিয়া তাঁহাকে তাকিয়ার নিকট বসাই-তেন! অভ্যাগত গুরুতুল্য, তাঁহার ব্যব-হারে এই নীতি আমাদের চক্ষে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি সামান্য একজন মুহুরীকেও কত সম্মান ও আদর দেখাইয়া নিজ হস্তে তাম্বুল দিতেন! এদিকে কোন জজ বা ম্যাজিষ্ট্রেটও তাঁহার বাড়ীতে পূর্ব্বে না আসিলে তিনি আগে দেখা করিতে যাইতেন না।

দিগম্বর বাবুর সর্ব্বপ্রধান গুণ ছিল স্ত্রীলোকের প্রতি মাতৃভাব। স্ত্রীলোককে এত সম্মান করিতে আমি আর কাহা-কেও দেখি নাই। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কথা বলিতে যাইয়া তাঁহার ভাষা শিশুর ন্যায় কোমল হইয়া যাইত। অনেক সময়ে তীর্থবাসিনী রমণীগণের ধর্ম্মবিশ্বাস ও দয়াদাক্ষিণ্যের কথা বলিতে বলিতে

তাঁহার মুখে বালকের ন্যায় নির্ম্মলতা প্রকটিত হইত।

দিগম্বর বাবু একরূপ চিররুগ্ণ ছিলেন। ফরিদপুরে আসা অবধি তাঁহার হাঁপানি রোগ সারিয়া যায়, কিন্তু ১২।১৩ বৎসর যাবৎ তিনি উৎকট বৃক্ক (kidney) রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। এই পীড়ায় তিনি সময়ে সময়ে হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। কয়েকবার মুমূর্ষু অবস্থা হইতে তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। অনেক সময়েই ডাক্তারদের উপদেশ অনুসারে জলের পরিবর্ত্তে 'লিথিওয়াটার' পান করিতেন। ১৩০৭ সালের জৈষ্ঠ্য মাসে একদিন তিনি প্রাতঃকাল হইতে ১০টা পর্য্যন্ত রীতিমত আফিসের জন্য খাটিয়াছিলেন, কাঞ্চনপুরের মোকদ্দমার নথিপত্রগুলি দেখিয়াছিলেন,—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মৈত্রেয় ও মথুরানাথ

মৈত্রেয় উকীলদ্বয় তাঁহার সম্মুখে কাজ-কর্ম্ম করিতেছিলেন, তাঁহারা তাঁহার কোনরূপ উদ্বেগ লক্ষ্য করেন নাই। আহারের পর কাছারী যাইবার জন্য বাহির বাড়ীতে আসিতে পথে স্নেহাস্পদ গঙ্গাদাসকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এত বেলা হইয়াছে স্নান কর নাই যে!" ইহাই তাঁহার শেষ কথা, পরমুহূর্ত্তেই তিনি হঠাৎ কাঁপিয়া পড়িয়া গেলেন। সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার ফিঙ্ক, এবং অপরাপর ডাক্তার-কবিরাজগণ তাঁহাকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিতে আসিয়াছিলেন। কাছারী যাইবার পোষাক ও পাল্কী পড়িয়া রহিল। তৎস্থলে গরদের ধুতি ও শ্মশানশয্যা আনীত হইল।

তাঁহার মৃত্যু আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যেন একটি বালক ঘুমাইয়া

পড়িয়াছিল, এই যদি মৃত্যু হয়, তবে তাহার বিভীষিকা ও যন্ত্রণা কোথায়? তাঁহার সেই সময়ের চিত্র দেখিয়া শ্মশান-শয্যায়ও তাঁহাকে সুখস্বপ্নে বিভোর হাস্যমধুরমুখ নিদ্রিত ব্যক্তি বলিয়া ভ্রম জন্মিবে। এই সহাস্য আনন আমরা চন্দনার্দ্র করিয়া দিয়াছিলাম, তাঁহাকে গরদের ধুতি পরাইয়া গলদেশে রঙ্গন-ফুলের মালা দোলাইয়া দিয়াছিলাম। যখন রঞ্জিতমশারিশোভিত সুন্দর খট্টায় হাসিমুখে মাল্যকণ্ঠে দিগম্বর শ্মশানে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন সে দেবমূর্ত্তি দেখিয়া সকল লোকই বলিয়াছিল—"কি শান্তিময় মৃত্যু! যম তাহার স্বাভাবিক বিভীষিকা পরিত্যাগ করিয়া এই দেবপুরুষকে দেবলোকে লইয়া যাইতেছে।"

সে দিনের শোকোচ্ছ্বাস ভুলিব না,

বাজারের অনেক লোক তাঁহার নানা গুণ কীর্ত্তন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়াছিল। আম্রবিক্রেতৃগণ বালকের ন্যায় লুটাইয়া কাঁদিতেছিল; রোজ ১৫।২০ টাকার আম তাহারা আর কোথায় বিক্রয় করিবে! দরিদ্র, পঙ্গু, অন্ধ "আজ অনাথ হইলাম" বলিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। তাঁহার স্বর্গারোহণে সমস্ত ফরিদপুরবাসী লোকবৃন্দের ব্যাকুলতা, তাঁহার শ্যালকপুত্র শরতের তীব্র চীৎকার, গাভী ও ছাগলগুলির সাশ্রুনেত্র নিস্পন্দতা প্রভৃতি মিলিত হইয়া সে স্থানটিকে যেরূপ করুণ রসের সজীব প্রতিকৃতি করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা ভুলিবার নহে। আর শোকের প্রতিমূর্ত্তি নিঃসন্তান্ ম্রিয়মাণা অনাথিনীর ছবিখানি, আমাদের নিকট যে হৃদয়বিদারক শোকের কথা নীরবে প্রচার করিতেছিল, তাহা হৃদয়ে চিরমুদ্রিত

থাকিবে। সেই দিন ফরিদপুরের শিরোরত্ন খসিয়া পড়িয়াছে। চরিত্রবান্ ব্যক্তি শুধু স্বীয় পরিবারের জন্য নহেন, বিশ্বপ্রেমে তাঁহার সহিত সংসারের এক নিগূঢ় বন্ধন স্থাপিত হয়, ইহা সে দিন সম্যক্ উপলব্ধ হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ প্রচারিত হইবা মাত্র সমস্ত আফিস বন্ধ হইয়াছিল, দোকানীরা দোকান বন্ধ করিয়াছিল, আর সকলেই মনে করিতেছিল, "আমার পরম বন্ধু গেল।" পুত্রতুল্য স্নেহের পাত্র হৃদয়, শরৎ এবং যোগেশ বাবুর যেরূপ শোক হইয়াছিল, আমরা তাঁহার কেহ না হইয়াও সেদিন সেইরূপ শোক অনুভব করিয়াছিলাম। ফরিদপুরের উকীলগণ তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে যে সভা করিয়াছিলেন, তাহাতে কেহই কিছু বলিতে পারেন নাই। হরিশ বাবু

দাঁড়াইয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন, স্বনামখ্যাত বাগ্মীপ্রবর অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের শ্বেতশ্মশ্রু বহিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। তাঁহার বাগ্মিতা কোথায় ভাসিয়া গেল, নীরব শোকের অভিব্যক্তি যেন শব্দবিহীন ব্যাকুলতা দ্বারা সভাটী সার্থক করিয়া তুলিল।

আমরা অনেক সময় সায়ংকালে তাঁহার নিকট গিয়াছি, এখন সেই সান্ধ্য সম্মিলনের কথা মনে পড়ে। দিগম্বর বাবু মধুর কথায় তীর্থযাত্রার কথা কহিতেন। তিনি অনেক তীর্থপরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ঋষির আশ্রমের কথা, তীর্থবাসিনী পরদুঃখকাতরা রমণীগণের কথা, প্রাকৃতিক বিচিত্র দৃশ্যাবলীর কথা, বৃন্দাবনের শেঠদের কথা প্রভৃতি কত কথা কহিতেন। তিনি শান্ত মধুর ভঙ্গীর সহিত যে

নীতি ও ধর্ম্মের কথা বলিতেন, তাঁহার চরিত্রের জ্যোতিতে তাহা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, সেই সান্ধ্যসম্মিলন কি মধুর ছিল! কত সঙ্গীত, কত বক্তৃতা ও কত কৌতুক-মুখরিত সভাসমিতিতে গিয়াছি। কিন্তু একনিবিষ্টচিত্তে বসিয়া এই সজ্জন মহোদয়ের নিকট যে উপদেশময়ী কাহিনী শুনিয়াছি ও তাহাতে যেরূপ চিত্ত নির্ম্মল হইয়া গিয়াছে, এরূপ আর কিছুতেই হয় নাই। লোকের অন্নাভাবের কথা বলিতে যাইয়া দিগম্বর সরল কথায় আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিতেন, দুর্ভিক্ষপীড়িত কঙ্কালসার মনুষ্য আমাদের একান্ত পরিজনের মত বোধ হইত ও তাহাদের কথা ভাবিয়া হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইত। ক্ষণেকের জন্য পরের দুঃখ নিজের মত বোধ হইত, নিজের দুঃখ পরের দুঃখের মত বোধ হইত। মনুষ্যের সেবার জন্য

কিরূপ প্রাণ দিতে হয়, দিগম্বর তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার আত্মীয়েরা কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন, "হায়! তিনি আমাদের সেবার জন্য দেহপাত করিলেন, কৈ আমাদের সেবা ত একদিনের জন্যও গ্রহণ করিলেন না।"

হরিহর বাইতি

(ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য হইতে গৃহীত)

দুশ্চর তপঃসাধনার পর, লাউসেন হাকণ্ড নামক স্থানে সূর্য্যদেবের কৃপালাভে সমর্থ হইলেন ; সূর্য্যদেব পশ্চিমে উদিত হইয়া গৌড়বাসিগণের নিকটে লাউসেনের তপঃপ্রভাব প্রমাণিত করিবেন, এই বর-দান করিয়া ভক্তকে আশ্বস্ত করিলেন।

ধর্ম্মঠাকুরের পূজার ত্রুটির জন্য গৌড়ে অতিবৃষ্টি হইয়াছিল। তথাকার অধিবাসিগণ দুর্দ্দশার চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। সহসা একদিন বিস্মিত কৃষক লাঙ্গল হস্তে দেখিতে পাইল,—ঊষা পশ্চিমের নভঃস্থল স্বর্ণবর্ণমণ্ডিত করিয়া অপূর্ব্ব সুন্দরীর বেশে বিশ্বের দিকে চাহিয়াছেন,—এই অচিন্তিত-পূর্ব্ব

প্রাকৃতিক লক্ষণে গৌড়ের ঘরে ঘরে শুভ শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। পশ্চিমে উদিত সূর্য্যগোলকদর্শনে গৌড়বাসী হরিহর বাইতি আনন্দে স্বীয় ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিল। এ দৃশ্য,—অসম্ভবের সংঘটন,—এ দৃশ্যের ছটায় হরিহর বাইতি মুগ্ধ হইয়া গেল। যে দিক্ হইতে ঊষা প্রতিদিন উদিত হন—আজ সে দিক্ ঊষার মন্দীভূত প্রতিফলিত কিরণে মণ্ডিত হইয়াছে, কিন্তু পশ্চিম-দিগ্‌বিভাগ তরুণ সূর্য্য অঙ্কে লইয়া এক দিবসের জন্য অপূর্ব্ব গৌরবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সূর্য্যের এই পশ্চিমোদয়ের প্রধান সাক্ষী হরিহর বাইতি। হরিহর, ভাল করিয়া এই অতুল্য তপঃপ্রভাবের মহিমা দেখিয়া রাখ, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে এই আশ্চর্য্য কথা জ্ঞাপন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিও না।

তুমি প্রতিদিন প্রাতে এক লক্ষ হরিনাম জপ করিয়া থাক, তুমি গৌড়ের একজন প্রধান মণ্ডল। আজ যে পুণ্যদৃশ্য দেখিলে, তাহা ভাল করিয়া স্মৃতিতে অঙ্কিত করিয়া রাখ, রাজদ্বারে এ কথার সাক্ষ্যের জন্য তোমার আহ্বান হইতে পারে, তখন দ্বিধা-কম্পিতস্বরে মার্ত্তণ্ড-দেবের এই অসম্ভব কাণ্ডকে চক্ষের ধাঁধা বলিয়া জিহ্বা কলঙ্কিত করিও না।

লাউসেন গৌড়ে প্রত্যাগত হইয়াছেন; উৎকট তপশ্চরণজনিত পুণ্যের জ্যোতিঃ তাঁহার শুভ্র ললাট হইতে শিখার ন্যায় বিচ্ছুরিত হইতেছে; তাঁহাকে দেখিতে লোকে লোকারণ্য; সুমহৎ পুণ্যের প্রভা লাউসেনের বরণীয় মূর্ত্তিতে একটি অখণ্ড স্বর্গীয়শ্রী প্রদান করিয়াছে। গৌড়েশ্বর আহ্লাদে লাউসেনকে অভিনন্দন করিয়া লইলেন।

মহাপাত্র মাহুত্তার চক্ষে সেই দৃশ্য অসহ্য হইল ; রাজসকাশে অগ্রসর হইয়া মাহুত্তা নিবেদন করিল—"মহারাজ, বালকের কথায় কি অসম্ভব অলীক গল্পে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছেন? পশ্চিমে সূর্য্য উদিত হন্, এ কথা কি বিশ্বাস্য ? এই বালক যে সকল কথা আপনাকে বলিল, তাহার সমস্তই রূপকথা। নিজের মুণ্ড-চ্ছেদন্ করিয়া ত্রেতায় রাবণ তপস্যা করিয়াছিল। জগতে এরূপ তপস্যার কথা আর শোনা যায় না। এই বালক স্বীয় শিরশ্ছেদ পূর্ব্বক ধর্ম্মের আরাধনা করিয়াছে—এরূপ অসম্ভব কথার সাক্ষী কে? শামুলা স্ত্রীলোক, অতিরঞ্জন ও মিথ্যা রমণীজিহ্বার অলঙ্কার, আপনি কেন এমন সকল কথা বিশ্বাস করিতেছেন ? কপিল, পরাশর, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ঋষিগণ যাহা পারেন নাই, এই বালক তাহাই সিদ্ধ

করিয়াছে! সূর্য্যদেব ত একমাত্র হাকণ্ড কিম্বা ময়নাগড়ের নহেন, বিশ্বের সমস্ত লোক তাঁহার উদয়ের সাক্ষী, কে কবে দেখিয়াছে যে, সূর্য্যদেব পশ্চিমে উদিত হইয়াছেন? লাউসেনকে জিজ্ঞাসা করুন, তাহার সাক্ষী কে?

লাউসেন স্থির গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিলেন—আমার মিথ্যা বলার অভ্যাস নাই—আমার সাক্ষী হরিহর বাইতি।

রাজা হরিহর বাইতিকে তখনই রাজসভায় উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন। মহাপাত্র মাহুদ্যা অগ্রসর হইয়া বলিল—হরিহর অদ্য এক দূর পল্লীতে কোন বন্ধুর পিতৃশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছে, তাহাকে কল্য দ্বিপ্রহরে হাজির করিয়া দিব। যে পর্য্যন্ত হরিহরের প্রমাণ গৃহীত না হয়, সে পর্য্যন্ত লাউসেন এরূপ

অসম্ভব গল্প সৃষ্টি করার অপরাধে বন্দী থাকিবেন।

রাজসভা ভঙ্গ হইল। গৌড়বাসীর শঙ্কিত চক্ষু লাউসেনের জন্য মুহুর্মুহুঃ জলভারাচ্ছন্ন হইতে লাগিল; কিন্তু লাউসেন প্রফুল্লচিত্ত;—দুশ্চরতপা লাউ-সেন পার্থিব দুঃখ-বিপদ্‌কে একেবারেই গ্রাহ্য করিলেন না; বন্দীর তৃণশয্যা এবং রাজপর্য্যঙ্ক তাঁহার চক্ষে তুল্য, ধর্ম্মে অচলা ভক্তি তাঁহার আনন্দের চির-উৎসস্বরূপ। তিনি যে কারাগৃহে প্রবেশ করিলেন, তথায় তাঁহার সঙ্গে যেন নিবিড় দুর্ভেদ্য অন্ধকারে একটি উজ্জ্বল আনন্দের কিরণরেখা প্রবেশ করিল!

মাহুদ্যা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হরিহর বাইতিকে গোপনে ডাকিয়া আনিল। মাহুদ্যা-বর্ণিত তাঁহার বন্ধুর পিতৃশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণব্যাপার মিথ্যা,

হরিহরকে করায়ত্ত করিয়া লইবার অবকাশের জন্য এই কথা মহাপাত্রের উদ্ভাবিত একটা কৌশল মাত্র।

হরিহর উপস্থিত হইলে, মাহুদ্যা তাহাকে দুই শত টাকা ও দ্বাদশটি মোহর প্রদান করিয়া বলিল, কল্য রাজসভায় তাহাকে বলিতে হইবে, পশ্চিমে সূর্য্য উদিত হয় নাই। এই কথা বলার পর হরিহর বাইতি বিপুল অর্থ পাইবে, অদ্যকার এই সামান্য অর্থ তাহার পুরস্কারের সূচনা মাত্র। হরিহর অসম্মত হইল; কিন্তু মহাপাত্র বলিল—"অর্থই সর্ব্বধর্ম্মসার, এই অর্থদ্বারা পূজা, অর্চ্চনা ও তীর্থ ভ্রমণ করিয়া গৃহস্থগণ পরলোকে স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া থাকে। অর্থোপার্জ্জনকালে কেহই একান্তরূপে সত্য পালন করিতে সমর্থ হয় না—একান্তসত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে উপার্জ্জন সম্ভবপর

নহে, অথচ অর্থোপার্জ্জন না করিলে সমস্ত ভাবী পুণ্যসঞ্চয়ের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, তুমি ভাবিয়া দেখ, এই অর্থ উপেক্ষা করা তোমার উচিত কি না, তোমার অবস্থা তেমন ভাল নহে।”

হরিহর বাইতির মনে একটু একটু করিয়া লোভের উদয় হইতেছিল। সূর্য্যালোকের শেষ রেখা যেরূপ ধরিত্রীর বক্ষঃ হইতে একটু একটু করিয়া মুছিয়া যায়, অর্থের প্রলোভনে তাহার পুণ্যের বলও তেমনই ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হইতেছিল ; এই দুই শত মুদ্রা, দ্বাদশটি মোহর এবং আরও প্রচুর অর্থ মুহূর্ত্তে তাহার করায়ত্ত হইতে পারে, এবং তাহা হইলে তাহার অবস্থা কতটা উন্নত ও সচ্ছল হইয়া উঠিতে পারে, সে অল্প-কালের মধ্যে সেই স্বপ্নে বিভোর হইয়া পড়িল। কে যেন তাঁহার হৃদয় হইতে

সরিয়া দাঁড়াইল এবং কে যেন তাহার হৃদয়ে আসিল! তৎসঙ্গে সে নিবিড় আঁধারের সত্তা হৃদয়ে অনুভব করিল। মাহুদ্যার যুক্তির সারবত্তা সে যত না হৃদয়ঙ্গম করিল, তাহার পার্শ্বস্থ অর্থপূর্ণ-থলিয়ার মৌন আমন্ত্রণে সে তদপেক্ষা অধিকতর আকৃষ্ট হইল।

ভাবিয়া চিন্তিয়া হরিহর বাইতি বলিল—"তবে দিন্ থলিয়াটি, আপনার উপদেশ মানিয়া চলাই আমাদের কর্ত্তব্য, আপনি মুনিব। 'হাঁ' কি 'না' বলা যত সহজ, উপার্জ্জন তত সহজ নহে।" হরিহর বাইতি মাহুদ্যার নিকট মিথ্যা বলিতে প্রতিশ্রুত হইয়া বাড়ীতে ফিরিল।

তখন নিদ্রাদেবী শনৈঃ শনৈঃ গৌড়-নগর অধিকার করিয়া লইয়াছেন। মাতৃ-অঙ্কে শিশু যেরূপ শান্তিসুধা উপভোগ করে, ব্যথিত ও তাপিত ব্যক্তিগণ.

নিশীথিনীর ক্রোড়ে সেইরূপ বিশ্রাম পাইয়াছে ; একমাত্র হরিহর বাইতির চক্ষে নিদ্রা নাই—তাহার ব্যথা নিবারণের জন্য নিশীথিনী স্বীয় মন্ত্রপূত কর বুলাইয়া দিতেছেন. না—তাহার বালিসের নীচে দ্বাদশটী মোহর ও দ্বিশত মুদ্রা পরম পরিতৃপ্তি ও দুঃসহ ব্যথায় জড়িত হইয়া যে উৎকট অধৈর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে হরিহর বিনিদ্র হইয়া রহিয়াছে। সে কি যেন পাইয়াছে—তাহা যেমনই আনন্দ সহকারে আস্বাদ করিতে যাইবে, অমনি সে কি যেন হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার অস্পষ্ট বেদনাপূর্ণ স্মৃতি সেই আনন্দ-রসাস্বাদের বিঘ্ন জন্মাইতেছে।

পরদিন প্রাতে রাজার কোটাল হরিহর বাইতির বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া বলিল, "হরিহর তোমার রাজসভায় তলপ পড়িয়াছে—তুমি শীঘ্র এস।"

হরিহর বাইতি একলক্ষবার হরিনাম জপ করিয়া থাকে ; নামজপ পূর্ণ হইলে যাইবে, ইহা জানাইল। রাজার কোটাল যমদূতের ন্যায় দ্বারে বসিয়া রহিল।

হরিহর বাইতির স্ত্রী বিমলা আজ বিমনা ; তাহার স্বামী মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে যাইবে, বিমলার মুখখানি ছোট হইয়া পড়িয়াছে—সে যেন কি এক গৌরব-স্বর্গে সুখে ছিল, আজ তাহাকে কে সেই সুখের স্থান হইতে তাড়াইয়া দিবে! সে কখনও স্বামীর কার্য্যের প্রতিবাদ করে নাই, কিন্তু আজ মনের কথা না বলিলে বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। সে আজ পড়সীদের সঙ্গে স্নান করিতে গেল না, গৃহের এক প্রান্তে সাশ্রুনেত্রে উদাসিনীর মত বসিয়া রহিল ; তাহার কিছু ভাল লাগিল না—অবশেষে কুম্ভকক্ষে একাকিনী মন্থরগতিতে সে জয়-সরোব্যরে

উচ্ছ্বাসদীপ্ত রামকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় পুস্তিকায় তাহা লিপিবদ্ধ আছে। কেশবচন্দ্রকে রামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া লোক ডাকিয়া বক্তৃতা করিবার প্রয়োজন হয় না। ফুল ফুটিলে ভ্রমর সন্ধান করিয়া আপনিই সেই স্থানে আসিয়া থাকে। প্রকৃত সাধু যে পল্লীতে বাস করিবেন, নগর ও রাজধানী ত্যাগ করিয়া লোক দলে দলে বিনা নিমন্ত্রণে আসিয়া তাঁহার কথা শুনিয়া যাইবে।

এই একান্ত নিরক্ষর ব্রাহ্মণ হিন্দু-জাতির যে তপঃপ্রভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহার কণিকামাত্র লাভ করিয়া এক উৎসাহিত কায়স্থ যুবক সমস্ত জগতে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন।

গ্রন্থকারের লিখিত অপরাপর পুস্তক
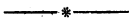
নাম	মূল্য
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য	৪৲
রামায়ণী কথা	১॥০
তিনবন্ধু	১৲
বেহুলা	৸০
ফুল্লরা	৸০
সতী	৸০
জড়ভরত	৸০
পদ্যসন্দর্ভ	।/০
History of Bengali Language and Literature	১২৲

স্নান করিতে গেল, তাহার চক্ষুর পক্ষ্মে কয়েকটি অশ্রুবিন্দু সংলগ্ন ছিল। কোটা-লের সঙ্গে তাহার স্বামী রাজসভায় যাইবে—মিথ্যা কথা কহিতে। তাহার মনে হইল, শাক-শবজি খাইয়া কুঁড়েঘরে থাকিয়া সে ত স্বর্গসুখে ছিল, সে বড় বাড়ী, ভাল খাওয়া এ সকল চাহে না। "হে ভগবন্, আমার শাকসবজী বজায় রাখ, :আমি কুঁড়ে-ঘরে সুখে আছি, আমার সুখ ভেঙ্গ না" বলিয়া বিমলা দুঃখিতচিত্তে শূন্য কুম্ভ জলে ভাসাইয়া একাকিনী জয়-সরোবরের জলে নামিল। সহসা একটা দূরাগত করুণ আর্ত্তস্বরে সে চমকিয়া উঠিল, সে দেখিতে পাইল হঠাৎ গগনপ্রান্তে নিরবলম্বভাবে কুজ্ঝটি-কার অস্পষ্ট আচ্ছাদনে আবৃত সাতটি পুরুষ তাহার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। তাহাদের ব্যাকুল দৃষ্টি ও ক্ষীণদেহ বিম-

লার মর্ম্মস্থল শেলের মত বিদ্ধ করিল। তাহারা ক্ষীণ আর্ত্তস্বরে বলিল—"বিমলা, আমরা হরিহরের পিতৃপুরুষ, হরিহরের মিথ্যাচরণে স্বর্গ-ভ্রষ্ট হইব—আমাদের আর দাঁড়াইবার স্থান থাকিবে না। বিমলা, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর, আমরা বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছি।" তাহাদের বিবর্ণ মুখ শুষ্ক ও বিশীর্ণ, চক্ষু অশ্রু-বিজড়িত; সপ্তপুরুষ এই কথা বলিয়া শূন্যপথে মিশিয়া গেল। বিমলা স্বপ্নের মত এ কি দেখিল! সে কাঁদিতে কাঁদিতে শূন্য কুম্ভ কক্ষে লইয়া বাড়াতে ফিরিয়া আসিল।

তখন হরিহরের লক্ষ নাম জপ শেষ হইয়াছে। কোটালের সঙ্গে রাজদ্বারে যাইতে হরিহর উদ্যত। এমন সময়,—

"আলয় প্রবেশে রামা আউদর চুলে।
পড়িল পতির পায় প্রাণ নাহি বান্ধে।

কি হ'ল কি হ'ল ব'লে উচ্চস্বরে কাঁদে।
সুবিহিত শুন নাথ সবিনয়ে বলি।
কি ছার ধনের লাগি ধর্ম্ম দিবে কালী।
ধন কড়ি মান মত্তা সকলি বিফল।
সপ্তম পুরুষ আজ যায় রসাতল।”

এলায়িত কুন্তলে, সাশ্রুনেত্রে, কোমল ভুজলতায় স্বামীর পদ বিজড়িত করিয়া আজ পল্লীর অশিক্ষিতা ললনা স্বামীকে সত্য কহিতে উদ্রিক্ত করিতেছে—“যুধিষ্ঠির স্বয়ং ভগবানের কথায় মিথ্যা বলিয়া শাস্তি হইতে ত্রাণ পান নাই। রাজদ্বারে মিথ্যা বলিও না—আমি কুলবধূ কি বলিব!”—বলিয়া বিমলা কাঁদিতে লাগিল। হরিহর মিথ্যা না বলিলে মাহুদ্যার ক্রোধে প্রাণ হারাইবে,—এ সকল কথা বিমলার কর্ণে প্রবেশ করিল না—সে কেবল বলিতে লাগিল—“সত্য পথের সহায় ভগবান্, কে কাহাকে মারিতে পারে?”

হরিহর বাইতি বলিল—"অর্থ ভিন্ন পুরুষের জীবন বিফল—আমি তোমার' সুন্দর হস্তে সোণার চূড়ী পরাইব, সোণার হার তোমার কণ্ঠে দিব, সুন্দর ও বহুমূল্য সাড়ী দ্বারা তোমার কোমল অঙ্গের শ্রীসাধন করিব" এই সময় কোটাল—"আর বিলম্ব করিও না" বলিয়া হাঁকিতে লাগিল—লক্ষহরিনাম-জপকারী হরিহর বাইতি রমণীর প্রতি প্রলোভনসূচক বাক্যাবলী অর্দ্ধ সমাপ্ত রাখিয়াই প্রস্থান করিল।

বিমলার কি এক স্বর্গ যেন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল, অসম্বৃত কেশপাশে ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

হরিহর বাইতি স্ত্রীকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিয়াছিল—সে কি নিজের কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিয়াছে? সে হৃদয়ে একটা গুরুতর ব্যথা অনুভব করিতে

লাগিল। তাহার মন প্রতিমুহূর্ত্তে পূর্ব্ব শান্তি ফিরিয়া পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল। মহাপাত্র মাহুদ্যার সঙ্গে কল্য দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্ব্বে তাহার গৃহে ও মনে, যে অব্যাহত একটা শান্তির স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, পুনরায় তাহাতে অবগাহন করিয়া শীতল হইবার জন্য তাহার মনে একটা নিরতিশয় প্রবল আকাঙ্ক্ষা মৌনভাবে জাগিয়া উঠিল।

রাজসভা লোকপূর্ণ। একদিকে বন্দী লাউসেন দাঁড়াইয়া আছেন। হরিহর বাইতি সভায় প্রবেশ করার সময় জনবৃন্দ একবার দ্বিধাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে মৌনভাবে তাকাইল। নির্ম্মল প্রসন্ন দৃষ্টি দ্বারা হরিহরের অন্তঃকরণ ধৌত করিয়া লাউসেন একবার তাহার দিকে চাহিলেন; পৌরজনের আশঙ্কা-কাতর দৃষ্টি ও লাউসেনের স্নিগ্ধ কটাক্ষে

সহসা যেন বিমূঢ় হরিহরের কর্ত্তব্যপথ নিরূপিত হইয়া গেল। পশ্চিমে সূর্য্যোদয় দেখিয়াছ কি না, এই প্রশ্ন হওয়ামাত্র অপূর্ব্ব উৎসাহে হরিহর বাইতি বলিয়া উঠিল—"যে পথে সূর্য্যদেব প্রত্যহ অস্ত গমন করেন, আমি সেই পথ হইতে তাঁহার উদয় দেখিয়াছি—দেখিয়াছি পশ্চিম আকাশ তপ্ত স্বর্ণের আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, প্রত্যূষে আমার গৃহের পশ্চিমের ক্ষেত্র স্বর্ণ-ফসলে আবৃত হইয়া উঠিয়াছিল, এমন দৃশ্য আর কখনও দেখি নাই—লাউসেন বাহাদুরকে প্রণাম করিতেছি—ইনি তপঃসিদ্ধ মহাপুরুষ।" অশ্রুগদ্‌গদকণ্ঠে অনুতাপধৌত নির্ম্মলহৃদয়ে—ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া হরিহর বাইতি কৃতাঞ্জলি হইয়া লাউসেনকে প্রণাম করিল; সেই মুহূর্ত্তে তীব্রতম দণ্ডের জন্য হরিহর প্রস্তুত

হইয়া নির্ভয় হইল। সভাস্থলে সমাসীন শত শত মুখ-নিঃসৃত অস্পষ্ট গুঞ্জন—মধুকরের সমবেত আনন্দধ্বনির ন্যায় তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল ; মরুভূমির তৃষিত ও শ্রান্ত পথিক সুস্নিগ্ধ বারি পান করিয়া যে আনন্দ প্রাপ্ত হয়, হরিহর সেই আনন্দ প্রাপ্ত হইল।

কিন্তু এদিকে মাহুদ্যার ক্রোধবিবর্ণ মুখ নিবিড় মেঘমণ্ডলের মত হইয়া গিয়াছিল—সেই ক্রোধোৎপন্ন অশনি হরিহরের মস্তক দ্বিধা বিদীর্ণ করিবে—তাহা হইতে কে তাহাকে রক্ষা করিবে ? লাউসেন অভিনন্দিত হইলেন, মাহুদ্যা পরাস্ত হইল, হরিহর বাইতি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

সেই দিনই রাজভাণ্ডারের দ্বিশত মুদ্রা ও দ্বাদশটি মোহর চুরির অপরাধে হরিহর বাইতি ধৃত হইল ; হরিহর সেই

অর্থ ফিরাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে যখন মাহুদ্যার গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল—সেই সময় পথে কোটাল তাহাকে চোর বলিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। বিচারে হরিহরের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। অষ্টহস্তপ্রমাণ তীক্ষ্ণাগ্র শূল তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, ভয়ে হরিহর বাইতি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল এবং অবিলম্বে তাহার মৃত্যু হইল, তাহাকে শূলে চড়াইবার প্রয়োজন হইল না। বিমলা পতির সঙ্গে সহমৃতা হইল।

ধর্ম্মমঙ্গলকাব্যে লখ্যা ডুম্নী, হরিহর বাইতি প্রভৃতি বহুসংখ্যক ব্যক্তির উপাখ্যান দ্বারা দৃষ্ট হয়—সত্য-রক্ষা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী একসময়ে বঙ্গদেশে কিরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল—ধর্ম্মমঙ্গলকাব্যের এই সমস্ত উপাখ্যান নানারূপ কল্পনায় অতিরঞ্জিত হইয়া কীর্ত্তিত

হইয়াছে। জটিল ও নিবিড় সুবৃহৎ কল্পনা হইতে ইতস্ততঃ প্রতিফলিত সত্যের কিরণরেখা আমাদিগকে একটি প্রকৃত ঐতিহাসিক জগতের সন্ধান দিতেছে। রাজদ্বারে মিথ্যা কথা না বলিলে মৃত্যুর আশঙ্কা—মিথ্যা বলিলে প্রচুর ঐশ্বর্য্য করায়ত্ত হইবে, এই সমস্যার ইতি-কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আজ কাল কয়জন বাঙ্গালী হরিহর বাইতির মত দুশ্চিন্তায় নিপীড়িত হইবেন! স্বামীর নৈতিক অধঃপতনে বিমলা যেরূপ মর্ম্ম-ব্যথা পাইয়া সহধর্ম্মিণী নামের সার্থকতা করিয়াছিল—আজ বঙ্গের কতজন গৃহ-লক্ষ্মী মিথ্যাচরণের বিরুদ্ধে স্বামীকে সেই ভাবে উদ্বোধিত করিতে পারেন? ধর্ম্ম-মঙ্গল কাব্য, নানা অতিরঞ্জিত ও কাল্প-নিক সাজসজ্জার অভ্যন্তর হইতে, যে সামাজিক চিত্র উদ্ঘাটন করিয়া

দেখাইতেছে, তাহা আমাদিগের অতীত গৌরবের কথা স্মৃতিপথে উদ্দীপিত করে। যে সমস্ত মহৎ গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে জাতীয় জীবন সমুজ্জ্বল হয়—এই সমস্ত নিবিড় কাল্পনিক উপাখ্যানের ভিতর আমরা সেই পৌরুষদৃপ্ত চরিত্র-গৌরবের আভা দর্শন করি। সত্যের প্রতি বিপুল আস্থা ও মিথ্যার প্রতি অখণ্ড ঘৃণা যখন পল্লীর নিম্নশ্রেণীর কুটীরেও এরূপ সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত ছিল—তখন বঙ্গদেশ প্রকৃতই স্বর্গোপম ছিল।

এ দেশের প্রাচীন আদর্শ
ও
রামকৃষ্ণ পরমহংস।

কতকগুলি সামগ্রী এমন আছে, যাহা হাটের জিনিষের মত বিকায় না। সাংসারিক হিসাবে তাহাদের খুব একটা দরও কল্পনা করা যায় না ; সেগুলি না থাকিলে যে সংসার চলিবে না, এবং পার্থিব ঐশ্বর্য্যের ষোল কলার কোন কলা বাদ থাকিবে, এমন নহে ; অথচ সেই সকল সামগ্রীকে মানুষ যত মূল্য দিতে পারে, প্রয়োজনীয় কোন বস্তুকে তাহার শতাংশ দিতেও প্রস্তুত নহে।

হিমালয়ের মাথায় কাঞ্চনজঙ্ঘা বলিয়া একটা চূড়া আছে ; ঐ চূড়াটা না থাকিলেও হিমালয়ের প্রায় সমগ্র সম্পদ্ অক্ষুণ্ণ থাকিবে, পর্ব্বতটা ওজনে বা আয়-

তনে যে নেহাৎ কমিয়া যাইবে তাহাও নহে। কাঞ্চনজঙ্ঘা সত্যসত্যই কাঞ্চন নির্ম্মিত নহে ; অপর শৃঙ্গগুলিও যেরূপ পাথর, এটিও তাহাই, অপরগুলিতে বরং গাছপালা কিছু কিছু জন্মে, তাহারা দশের কাজে লাগে, কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘা একবারে দুরধিগম্য, ব্যবহারিক হিসাবে উহার কোনই মূল্য নাই, উহা একান্ত উষর ও নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তথাপি কাঞ্চনজঙ্ঘা দ্বারাই হিমালয়ের সমস্ত মাহাত্ম্য। কাঞ্চনজঙ্ঘা আজ খসিয়া পড়িলে পর্ব্বত-সমাজে হিমালয়ের মাথা একবারে হেঁট হইয়া পড়িবে। এই অনাবশ্যক বাহুল্য-টির জন্যই আল্পস্, এটলাস্ প্রভৃতি পর্ব্বতমহলে হিমালয় স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে।

সকলেই শুনিয়াছেন, কোহিনূর মণির দাম পাঁচ জুতা, রণজিৎসিংহ এইরূপ

কথা বলিয়াছিলেন। কোহিনূরটা দিয়া সত্য সত্য কি লাভ হয়? হাটে বাজারে উহার কোন কাজ নাই, না খাইয়া মরিলে কোহিনূর কাহার জন্য খাদ্য কিনিয়া আনে না,—ব্যবহারিক জীবনে কোহিনূর ও একটা মাটীর ডেলাতে কোন প্রভেদ নাই, আছে সৌন্দর্য্য, তাহা ফুলেরও আছে; চন্দ্র, তারা, জ্যোৎস্না প্রভৃতি কত সামগ্রাতেই আছে, কিন্তু কোহিনূর রাজেন্দ্রের উষ্ণীষে যাইয়া স্থান লয় এবং উহার জন্য সম্রাটের সঙ্গে সম্রাটের ঘোর যুদ্ধ বাঁধিয়া যায়।

সাধুকেও কতকটা সেইরূপ অনাবশ্যক বাহুল্যের মত বোধ হইতে পারে। বুদ্ধদেব লোকের দুঃখ দেখিয়া রাজ্যত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু জরামৃত্যু এখনও লোককে আক্রমণ করিয়া পূর্ব্ববৎই নিপীড়িত করিতেছে—জীবের শত

শত কষ্ট, আধি ও ব্যাধির খরস্রোতঃ পূর্ব্ববৎই প্রবাহিত। তিনি আসিয়া জগতের কি করিয়া গিয়াছেন ?

সাধুর কথা হাটে বিকায় না। সাধু বলিতেছেন, এক গণ্ডে চড় খাইয়া আর এক গণ্ড ফিরাইয়া দাও, যে তোমার কোট চুরি করিতে আসিয়াছে, তাহাকে পাণ্টুলানটিও দিয়া ফেল ; যে তোমাকে বেগার খাটাইবার জন্য এক ক্রোশ পথ লইয়া গেল, তুমি আরও দুই ক্রোশ হাঁটিয়া তাহার বেগার খাট। এ সকল কথা কি কোন হাটে বিকায় ? সত্য সত্য কি প্রহারকর্ত্তার দিকে আর একটি গণ্ড কেহ ফিরাইয়া দিয়াছে, সত্য সত্য কি বাটিচোরকে ডাকিয়া কেহ ঘটিটা পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়াছে, না কোন বেগার অত্যাচারীর জন্য এক ক্রোশের স্থলে দুই ক্রোশ হাঁটিয়া গিয়াছে ?

সাধুর উক্তি বাজারে বিকায় না, উহা এত বড় কথা যে, আমাদের মাথা ডিঙ্গাইয়া চলিয়া যায়; সাধু বলিবেন, এ সংসারকে বিষবৎ ত্যাগ কর; পুত্র কলত্র কিছু নহে, সাধুর এমন সকল উক্তি মানিয়া কি ঘর করা চলে?

সুতরাং সাধু কতকটা কাঞ্চনজঙ্ঘা বা কোহিনূরের মত, তিনি মাথায় চাপিয়া বসিতে জানেন, অথচ তাঁহা-দ্বারা কোন কাজই হয় না; তাঁহার কথা শুনিলে সবদিকেই সর্ব্বনাশ! কাঞ্চনগুলি আস্তাকুঁড়ে ফেলিয়া দিতে হয় এবং আদালতের ন্যায়সঙ্গত মামলাগুলি ছাড়িয়া দিয়া প্রতিপক্ষকে বাড়ীতে আনিয়া ফলাহারে পরিতৃপ্ত করাইতে হয়। সাধুর কথায় সংসার অচল হইয়া উঠে।

ভারতবর্ষের সঙ্গে অপর দেশের

একটা প্রভেদ আছে—ভারতবর্ষ কোন কথাই ছোটখাটো করিয়া বলিতে পারে না; যাহা বলিবে, তাহা অসম্ভব পরিমাণে উচ্চ কথা; তাহা মানুষের কুটীর ডিঙ্গা-ইয়া চলিয়া যায়, "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" এখানে কীটপতঙ্গ সকলেই ভূতের অন্তর্গত। অপর সকল দেশ যখন 'স্বজাতি' 'স্বদেশ' প্রভৃতি শব্দের সৃষ্টি করিয়া স্বীয় গণ্ডীকে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত, এবং স্বীয় স্বার্থকে প্রবল করিয়া অপরের স্বার্থ নষ্ট করিবার চেষ্টাকে জাতীয় প্রেমের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে,—ভারতবর্ষ তখন জগতের হিত সার্ব্বভৌমিক প্রীতি প্রভৃতি ভাবের দোহাই দিয়া পর-বিদ্বেষের অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিল, ভারতবর্ষের প্রত্যেক বালক মুখস্থ করিয়া থাকে "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" "সর্ব্বত্রা-

ভ্যাগতো গুরুঃ” সে অভ্যাগত কে, তাহার পরিচয় লইবার প্রতীক্ষা করিতে গৃহস্থ অধিকারী নহে।

এত বড় কথাগুলি যে, ভারতবর্ষে বিফল হইয়াছে—তাহা নিতান্ত স্থূলদর্শিগণই কহিবেন। এই কথাগুলির ভাব ভারতবর্ষের অস্থিমজ্জার ভিতর আছে, যদি তাহা না হইবে, তবে যত বড় উচ্চ কথাই হউক না কেন, তাহা অনুষ্ঠান করিবার যোগ্য ব্যক্তি এখনও এদেশে জন্মগ্রহণ করেন কেন ?

রামকৃষ্ণ পরমহংস যে ভাবে জীবন যাপন করিয়াছেন, তাহাতে দৃষ্ট হইবে, জগতের সার্ব্বভৌমিক তত্ত্ব এখনও হিন্দুর করায়ত্ত। উহা শুধু ভূর্জ্জপত্রের পুঁথিতে আবদ্ধ শ্লোকমালা নহে, উহা এখনও হিন্দুর জীবনে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের প্রতি লক্ষ্য করিলে

দৃষ্ট হইবে, এখনও বহুসংখ্যক লোক পিপীলিকাকে মিষ্টদ্রব্য দান করিয়া "আত্ম-বৎ সর্ব্বভূতেষু" শ্লোকের মর্ম্ম জীবনে অনুষ্ঠান করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে, এখনও ভারতবর্ষের বহুসংখ্যক লোক নিরামিষ ভোজন করেন এবং যাঁহারা আমিষ ভক্ষণ করেন, তাঁহারাও নিরা-মিষাশীকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখেন, —উন্মত্ত বা বুদ্ধিহীন মনে করেন না। এখনও ভগবানের নাম লইয়া আহ্বান করিলে ভারতবর্ষের দূর সীমান্ত হইতে সাড়া পাওয়া যায়, এখনও কুম্ভমেলার দৃশ্য দেখিলে মনে হয় না যে, ভারত-বর্ষে ধর্ম্মের লোপ হইয়াছে।

দারিদ্র্য ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান বিপদ্ নহে। দরিদ্র ভারতবর্ষ সহস্র সহস্র বৎসর টিকিয়া আছে, কিন্তু ধর্ম্মহীন ভারতবর্ষ একদিনও টিকিবে না। যে

দেশের ঈশ্বর ভস্মে পরিতৃপ্ত,—শ্মশান-বাসী এবং ভিক্ষা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করেন, সে দেশ দারিদ্র্যকে ভয় করে না, বরং অনেক সময় উহাকে পরম সম্পদ্ বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। এ দেশ ক্ষমতাশালী রাজা বা ধনকুবেরগণের পূজক নহে, এ দেশ নগ্নদেহ উপবাসশীর্ণ ভিক্ষুর পূজক। অপর দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের এই স্থানে প্রভেদ, অপর দেশ পার্থিব সম্পদ্‌কেই পরম সম্পদ্ জ্ঞান করিয়া থাকে, কিন্তু ভারতবর্ষের রাজ-পুত্রগণ ঐহিক সম্পদ্‌কে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া ত্যাগী হইয়া পূজ্য হইয়াছেন। যতদিন ভারতবর্ষে এই আদর্শ বজায় থাকিবে, ততদিন ভারতবর্ষের ধ্বংস নাই। আমরা পার্থিব ঐশ্বর্য্য কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভকেই যদি চরম উন্নতি মনে করিয়া থাকি, তবে আমাদের

সনাতন আদর্শ হইতে অনেকটা নীচে নামিয়া দাঁড়াইতে হইবে। প্রতিবাসী ও একান্ত নিকটস্থ বলিয়া রামকৃষ্ণকে আমাদের উপেক্ষা করা চলে না, ভারতবর্ষের প্রকৃত সম্পদ্ যে নষ্ট হয় নাই, তাহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। জাপান যাহা দেখাইয়াছে, জর্ম্মণী হয় ত তাহা দেখাইতে পারে; কিন্তু এক স্থানে শুধু বসিয়া থাকিয়া সেই স্থানকে তীর্থে পরিণত করিতে পারেন, এরূপ নিশ্চেষ্ট গুণবান্ পুরুষের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে সুলভ নহে।

রাষ্ট্রনীতিকে আমরা যে প্রাধান্য দিতে চাহি, আমাদের অস্থিমজ্জা উহার সে প্রাধান্য স্বীকার করে না; অলক্ষিতভাবেধর্ম্ম নীতিই আমাদিগকে শাসন করিতেছে। যাহা সাধনার ধন ও হৃদয়কে প্রকৃত মহাগুণে বিভূষিত করিতে পারে,

অন্য দেশের হাটে এরূপ তত্ত্বকথার বেচা-
কেনা নাই, এদেশের লোক সেই জিনিষ
পাইলে সোণারূপার দর কষিতে অপেক্ষা
করিবে না, গুরু পাইলে সর্ব্বস্ব তাঁহার
পাদপদ্মে বিকাইয়া ছায়ার ন্যায় তাঁহার
অনুবর্ত্তী হইবে। এইজন্য বিনা আহ্বানে
বিনা নিমন্ত্রণে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে
শত শত যাত্রী যাইতেছে। একজন
অশিক্ষিত, অতি-দরিদ্র, অন্নহীন, বস্ত্রহীন,
নগ্নকায় ব্রাহ্মণ দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-
প্রান্তে নির্জ্জনে কি চিন্তা করিয়াছিলেন,
তাহাই বলিতে যাইয়া ভক্তগণ
পাশ্চাত্যজগতে আন্দোলন উপস্থিত
করিয়াছেন। তিনি কাহাকেও আহ্বান
করেন নাই, অথচ তাঁহার পাদ-
পদ্মপ্রভায় প্রাণ বিকাইতে শত শত
লোক নানা দূরদেশ হইতে কেন
আসিল? কত বিজ্ঞাপন, কত আবেদন-

নিবেদনে যে অর্থ সংগৃহীত হয় না, সেই নগ্নদেহ ক্ষেপা ব্রাহ্মণের মঠের জন্য সেই বিপুল অর্থ কে কোথা হইতে ছড়াইতেছে ? ইহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষ যাহা চায়, তাহা তিনি দিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ যে এখনও এ দেশে আছেন, রামকৃষ্ণই তাহার প্রমাণ, উপনিষদের ঋষিগণের সঙ্গে সর্ব্বাংশে ইনি এক পংক্তিতে একাসনে বসিবার যোগ্য।

বাবর তাঁহার আত্মজীবনচরিতে বলিয়া গিয়াছেন, "এ দেশের উপর খোদাতালার এমন কৃপা যে, গাছের উপর দুই টুক্‌রা রুটী ও একটু জল রাখিয়া দিয়াছেন, (নারিকেল বৃক্ষ দেখিয়া বাবর এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন।) কিন্তু এদেশের লোকগুলি এরূপ বর্ব্বর যে, তাহারা প্রায় নগ্নদেহ।" শত শত বৎসর পূর্ব্বে

বাবর যাহা বলিয়াছিলেন, এখনও ভূপর্য্যটকগণ ভারতবর্ষ দেখিয়া সময়ে সময়ে সেই কথা শুনাইয়া যান। কিন্তু দারিদ্র্য লইয়া আমরা চিরকালই গৌরব করিয়া আসিয়াছি, ইহাই আমাদের বিশেষত্ব,—ইহা যদি ব্রহ্মজ্ঞানভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য আমাদের মাথা হেঁট হইবার কোন কারণ নাই। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে উচ্চ ধর্ম্মতত্ত্ব মিথ্যা, এই বলিয়া যাঁহারা রাজসিক ধর্ম্মকে অবলম্বন করিতে পরামর্শ দেন, তাঁহাদের নিকট এই বক্তব্য যে, সাত্ত্বিক ধর্ম্মের সন্ধান যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারা রাজসিক ধর্ম্মকে প্রাধান্য দিতে পারিবেন কেন? যেটা বড় উজ্জ্বল, তাহা সকলের চক্ষে সহ্য হউক না হউক, ভারতবর্ষ সেই আলোকেই অভ্যস্ত। দরিদ্রের কুটীরে অল্প আলোই যথেষ্ট, তথাপি

সমস্ত সৌরকরদীপ্তি খড়ের চালের প্রতিটি তৃণ উদ্ভাষিত করিতে চায় কেন? ক্ষুদ্র তারকার আলোই একটি কীটের পক্ষে যথেষ্ট, তথাপি পূর্ণচন্দ্রের সমস্ত জ্যোৎস্না-বৈভব তাহার ক্ষুদ্র দেহ স্পর্শ করে কেন? সার্ব্বভৌমিক তত্ত্ব ভারতবর্ষ পাইয়াছে, তাহা হইতে অতি হীন ব্যক্তিকেও বঞ্চিত করা পাপ। ভারতবর্ষের দৃষ্টি আঁতুর ঘরে নহে,— উহা শ্মশানে, চিতার অগ্নিতে। জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুকেই এদেশ বেশী চিনিয়াছে; অপরের নিকট ঐহিক ঐশ্বর্য্য ধ্রুব সত্য, ভারতবাসীর নিকট সেই ঐশ্বর্য্য ক্ষণভঙ্গুর, এই তত্ত্বই ধ্রুব সত্য। এই অবস্থায় সার্ব্বভৌমিক তত্ত্ব গ্রহণ করা তাহার পক্ষে সহজ, উহা কখনই অনায়ত্ত বলিয়া সে অগ্রাহ্য করিতে পারে না।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমানকালের শ্রেষ্ঠ

গৌরব আমরা এদেশের সনাতন শিক্ষার ফলেই পাইয়াছি। রামকৃষ্ণ কোন দিন ইংরাজী স্কুলে পড়েন নাই। এখনও যে শত শত নরনারী নানাবিধ কষ্ট সহ্য করিয়া দূরদূরান্তর হইতে দক্ষিণেশ্বরে সমাগত হয়—তাহারা কি রাজসিক ধর্ম্ম ভাল বুঝে না সাত্ত্বিক ধর্ম্ম ভাল বুঝে? পল্লীতে পল্লীতে যে বাউলসংগীত, রাম-প্রসাদের গান, কৃষ্ণলীলার অভিনয় সর্ব্বদা হইয়া আসিতেছে, কৃষকেরা লাঙ্গলের উপর ভর দিয়া যাহা শুনিতে শুনিতে মাতিয়া যাইতেছে, সেই সকল ব্যাপারের প্রধান লক্ষ্য কি সাত্ত্বিক ধর্ম্ম নহে? আমাদের ঘরে ঘরে উপবাসশীর্ণা, দেবতার প্রতি অচলভক্তিসম্পন্না নিষ্ঠা-বতী অন্নপূর্ণারা যে ত্যাগস্বীকার করিতে-ছেন, তাহা কি সাত্ত্বিকবৃত্তির অনুপ্রাণনায় নহে? পাশ্চাত্য আদর্শ ভারতবর্ষে

খুঁজিলে নিরাশ হইতে হইবে, তাহাদের আসবাব্ এদেশে কিছুই নাই, কিন্তু এদেশের প্রকৃত বল যেখানে, সেখানে খুঁজিয়া দেখ, উপকরণ যথেষ্ট আছে— এখনও সেই সকল উপকরণে রামকৃষ্ণের মত মহাত্মার আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব নহে।

যুবকের সঙ্গে বৃদ্ধ যদি মল্লবিদ্যায় মনোযোগী হয়, তবে সে উপহাস্যাস্পদ হইবে, সন্দেহ নাই। এ জগতে বৃদ্ধের একটা স্থান আছে, তাহা যুবকের পদ অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। গুরুর পদে আসীন বৃদ্ধ শুক্লকেশমণ্ডিত হইয়া সকলের প্রণম্য হন। আমাদের জাতীয় জীবনে সেই বার্দ্ধক্যোচিত পূজনীয় পদ গ্রহণ করিবার সুযোগ আছে, তাহা প্রত্যাখান করা সঙ্গত নহে।*

* পরবর্ত্তী অংশে পরমহংস দেবের জীবনী সম্বন্ধে

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে রামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। তিনি অতি তেজস্বী ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ক্ষুদিরাম রামোপাসক ছিলেন এবং পদব্রজে ভারতবর্ষীয় অনেক তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণকে শিশুকালে সকলে গদাধর বা গদাই বলিয়া ডাকিত। তিনি বাল্যকালে যাত্রাগান, কথকতা প্রভৃতি শুনিতে ভালবাসিতেন এবং সেই অনুকরণে সঙ্গী লইয়া খেলা করিতেন। ঐ গ্রামের জমিদারদের একটি অতিথিশালা ছিল, সেই অতিথিশালায় সর্ব্বদাই

যে সমস্ত তত্ত্ব সঙ্কলিত হইয়াছে, তজ্জন্য আমি আমার স্নেহাস্পদ আত্মীয় শ্রীমান্ কুমুদ বন্ধু সেনের নিকট ঋণী।

সাধুসন্ন্যাসীরা আসিতেন। কথিত আছে, রামকৃষ্ণের মাতা একদিন তাঁহাকে এক খানি নূতন বস্ত্র পরাইয়া দিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণ অতিথিশালা হইতে ফিরিয়া আসিয়া মাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা, দেখ আমি কেমন সাধু হইয়াছি।" তাঁহার মা দেখিলেন, রামকৃষ্ণ নূতন কাপড়খানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া সাধু সাজিয়াছেন। প্রবাদ আছে যে, রামকৃষ্ণের যখন সাত বৎসর বয়স, তখন গ্রামের লাহা বাবুদের বাড়ীতে শ্রাদ্ধোপলক্ষে নানা দিগ্‌দেশ হইতে পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত হইয়াছিলেন; তাঁহারা রামকৃষ্ণের মেধা ও বুদ্ধিপ্রাখর্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

শৈশবেই রামকৃষ্ণের পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার অবস্থা বিশেষ সচ্ছল ছিল না। রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার

কলিকাতায় ঝামাপুকুরে টোল করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন।

রামকৃষ্ণ পড়াশুনায় অমনোযোগী ছিলেন; একদিন তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিয়াছিলেন, "যে বিদ্যায় চালকলা লাভ হয়, তাহা শিখিয়া কি হইবে?" তিনি নিজে বলিয়া গিয়াছেন যে, যখন তাঁহার একাদশ বৎসর বয়স, তিনি তখন মাঠের উপর দিয়া যাইতেছিলেন, নীল আকাশে নীলমেঘ ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহা দেখিয়া তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা লুপ্ত হয় এবং সেই দিন হইতেই তিনি "মায়ের" আবির্ভাব দেখিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার তাঁহাকে ঝামাপুকুরে লইয়া আসেন, রামকৃষ্ণ সুকণ্ঠ ও শ্রুতিধর ছিলেন, তিনি টোলের একপ্রান্তে বসিয়া নিশিদিন হরিনাম-গুণগান ও শ্যামা-

সঙ্গীতে আত্মহারা হইয়া থাকিতেন। কিছুদিন পরে জানবাজারের রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে মন্দির-প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। কিন্তু কোন পণ্ডিতই কৈবর্ত্ত বলিয়া তাঁহাকে মন্দির-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা প্রদানে স্বীকৃত হন না। শেষে রামকুমারের নিকট ব্যবস্থা লইতে আসিলে তিনি বলেন যে, ঐ মন্দির কোন ব্রাহ্মণ দ্বারা উৎসর্গ করা হইলে, তৎপ্রতিষ্ঠায় কোন বাধা নাই। রাণী রাসমণি সেইরূপ ব্যবস্থানুযায়ী গুরুকে দিয়া মন্দির উৎসর্গ করেন, কিন্তু কোন সুব্রাহ্মণ কৈবর্ত্তের ঠাকুরবাড়ীতে পূজরী হইতে চাহেন না। রাণী রাসমণি পুনরায় রামকুমারের নিকট লোক পাঠাইয়া দেন এবং তাঁহাকে ইহার ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। রামকুমার দেখিলেন, তাঁহার কথায় মন্দির প্রতি-

ষ্ঠিত করিয়া বিগ্রহের পূজা হইতেছে না, —স্থতরাং তিনি স্বয়ং পৌরোহিত্যের ভার গ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণ ভ্রাতার এই ব্যবহারে দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং বিষণ্ন হইয়া বলিয়াছিলেন, "যে বংশের কেহ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন জাতির দান গ্রহণ করেন নাই, তুমি সেই বংশে জন্মিয়া কৈবর্ত্তের পূজরীর চাকরি লইয়াছ।" অর্থলোভে ভ্রাতা এই কার্য্য করিয়াছেন, এই আশঙ্কায় রামকৃষ্ণ উক্তরূপ বলিয়াছিলেন, কিন্তু ভ্রাতা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, শাস্ত্রানুসারে কৈবর্ত্তের মন্দির-প্রতিষ্ঠায় কোন দোষ নাই। তিনি তাহা বুঝিয়া ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তাঁহার ব্যবস্থানুসারে মন্দির স্থাপন করিয়া রাসমণি বিপন্ন হইয়াছেন, এখন তাঁহার সরিয়া পড়া অন্যায়! অপর কেহ পুরোহিত হইবেন, ইহাই তাঁহার

বিশ্বাস ছিল—স্থতরাং এ সম্বন্ধে তাঁহার কোনরূপ অর্থলোভ ছিল না—এবং এখন বিপন্না রাণীকে তিনি ধর্ম্মকার্য্যে ব্রতী করাইয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন না, এই সম্বন্ধে রামকুমার অনেক শাস্ত্রের প্রমাণ প্রভৃতি দেখাইয়া দেন। ব্রাহ্মণের এরূপ কার্য্যে শাস্ত্রের কোন নিষেধ নাই। রামকৃষ্ণ এই উত্তরে প্রীত হন এবং এই সময় হইতে সর্ব্বদা দক্ষিণেশ্বরে থাকিতেন। একদিন তিনি আপনার মনে মহাদেবের মূর্ত্তি গড়িয়াছিলেন, উহা দেখিয়া রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাবু আকৃষ্ট হন, তিনি রামকৃষ্ণকে দেখিয়া চমৎকৃত হন। পরে রামকুমারের শরীর অসুস্থ হইলে, মথুরবাবু নানা অনুনয় বিনয় করিয়া রামকৃষ্ণকে শ্যামাপূজাকার্য্যে ব্রতী করেন। রামকৃষ্ণ বলেন যে, তিনি নিরক্ষর, পূজার নিয়মাদি

কিছুই জানেন না। মথুরবাবু তাঁহাকে তবুও পূজা করিতে নিযুক্ত করেন। রামকৃষ্ণ বৈধ পূজার কোন ধার ধারিতেন না,—তাঁহার মনে যাহা ইচ্ছা হইত, সেইরূপ করিতেন। আরতি করিতে করিতে কখনও তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন এবং 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিয়া অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতেন। কোন দিন বা আরতির সময় পঞ্চপ্রদীপ লইয়া দেবীকে বরণ করিতে দুই তিন ঘণ্টা কাটিয়া যাইত, বাদ্যকরের হস্তে ব্যথা হইত, কাঁসর বাজাইতে বাজাইতে লোকটা পরিশ্রান্ত হইয়া অবাক্‌ভাবে পুরোহিতের কাণ্ড লক্ষ্য করিত। যিনি জীবন দিয়া জগন্মাতার আরতি করিয়া-ছিলেন, সামান্য বাদ্যকর তাঁহার সঙ্গে তাল রাখিতে পারিবে কেন? দুই চারি দিন পরে রামকৃষ্ণ মথুরবাবুকে

বলেন যে, তিনি আর পূজা করিতে পারেন না। তিনি এই সময় সর্ব্বদাই অচেতন অবস্থায় থাকিতেন। কখন কখন গঙ্গাতীরে বালুতে মুখ গুঁজড়াইয়া "মা" "মা" বলিয়া কাঁদিতেন। কখন্ কখন কাতর হইয়া কাঁদিয়া বলিতেন, "মা, আমার অহং জ্ঞান নাশ কর্। দে মা, আমায় দীনের দীন হীনের হীন ক'রে দে মা। মা, আমি অষ্টসিদ্ধি চাই না, লোক-মান্য হইতে চাই না, আমায় দেখা দে মা।" কখনও বা তর্পণ করিবার জন্য হাতে জল লইবামাত্র তাঁহার শরীর এলাইয়া পড়িত। তিনি অবিরল চক্ষুজলে ভাসিয়া থর থর কাঁপিতে থাকিতেন এবং শিশুর ন্যায় 'মা', 'মা' বলিয়া আকুল হইয়া ডাকিতেন। দিন রাত এইভাবে অনাহারে অনিদ্রায় কাটিয়া যাইত। রামকৃষ্ণ যে সময় কঠোর

সাধনে প্রবৃত্ত হন, তোতাপুরী নামক জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট তিনি সেই সময় সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তোতাপুরী বৈদান্তিক যোগী ছিলেন। রামকৃষ্ণ যোগাসনে আসীন হইয়া এরূপ গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হন যে, ছয় মাস কাল তাঁহার বিন্দুমাত্র বাহ্যসংজ্ঞা ছিল না। একজন সাধু দণ্ড দ্বারা প্রহার করিয়া একটু চেতনাসঞ্চার করিতে পারিলেই মুখে দুধ এবং অপর কোন ভক্ষ্যদ্রব্য ঢালিয়া দিতেন। ইহাতেই তাঁহার শরীর কোনরূপে রক্ষা পাইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ জগতের সমস্ত ধর্ম্মমত সাধনা করিয়াছিলেন। এমন কি, তিনি মুসলমান ধর্ম্মমতেও সাধনা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধমতে কোন সাধনা করিয়াছিলেন কি না, তাহা কেহ বলিতে

পারেন না, কিন্তু প্রস্তরনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি তাঁহার ঘরে দেখা যাইত। যিশুর ধ্যানেও তিনি তিন দিন নিমগ্ন ছিলেন। এইভাবে জগতের সমস্ত ধর্ম্মমত সাধন করিয়া তিনি প্রচার করেন, "জগতের সকল ধর্ম্মই সত্য, সকলেরই লক্ষ্য এক।"

পরমহংসদেবের জীবনের পরবর্ত্তী অধ্যায় অনেকেই অবগত আছেন, কেশব চন্দ্র, প্রতাপ মজুমদার প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পড়েন। কেশবচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "চৈতন্য, যিশু প্রভৃতির নামমাত্র জানা আছে, কিন্তু তিনি তাঁহাদের তুল্যই এক মহাপুরুষের সাক্ষাৎলাভে কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন।" প্রতাপবাবু নব্যশিক্ষার অভিমানে নগ্ন-সাধুকে প্রথমতঃ উপেক্ষা করিয়া শেষে কি প্রকারে তাঁহাকে জগৎপূজ্য ভগবদ্ভক্ত বলিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন, তাঁহার